স্বস্তিকা

মূল্য : সাত টাকা

৬৪ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা।। ৯ এপ্রিল - ২০১২।।
২৬ চৈত্র - ১৪১৮

বর্ষশেষে বাঙালির পার্বন চড়কপুজো

কেন্দ্রীয় বাজেটে কোনও দিশা নেই, আছে শুধু আশঙ্কা ....পৃষ্ঠা - ১১

এবার ভারতবর্ষে 'লাহোর' ....পৃষ্ঠা - ১৫

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৭

তৃণমূল নেত্রীকে বিভ্রান্ত করছেন স্তাবকের দল ▯ ৮

বুদ্ধবাবুর স্বেচ্ছাচারিতার পথেই চলেছেন মমতা ▯ ৯

ফিন্‌সের সেমিনারে ইন্দ্রেশকুমার : উপাসনাপদ্ধতির বদল হতে পারে, জাতীয়তা নিয়ে কোনও সমঝোতা হয় না ▯ ১০

কেন্দ্রীয় বাজটে কোনও দিশা নেই, আছে শুধু আশঙ্কা ▯ এন সি দে ▯ ১১

এবার ভারতবর্ষে 'লাহোর' ▯ মুজফ্‌ফর হোসেন ▯ ১৩

উত্তরবঙ্গ ও ঈশানবঙ্গের অধ্যাত্ম-সাধন ধারায় শিব এবং তাঁর অনুসঙ্গী ▯ ডঃ শিবতপন বসু ▯ ১৫

গাজন-নীল-চড়ক ▯ সংকর্ষণ মাইতি ▯ ১৮

খোলা চিঠি : দিদি, একটা ঘুমের ওষুধ হবে? ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ২১

গগৈ 'উন্নয়ন'-এর দাবি করলেও অসমে বি পি এল-দের সংখ্যা জাতীয় গড়ের থেকে বেশি ▯ ২৪

পরহিতে জীবন উৎসর্গ করার দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন চুয়াল্লিশজন তরুণ ▯ ২৫

বিদ্যালয় স্তরে ধর্মশিক্ষা : পথ দেখাচ্ছে বাংলাদেশ ▯ বিশ্বনাথ দাস ▯ ২৭

মনোহরেই মজে আছেন মানস ▯ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২২ ▯ ▯ **ভাবনা-চিন্তা : ২৩** ▯ ▯ **অন্যরকম : ২৬** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩০ শব্দরূপ : ৩২** ▯ ▯ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

শিব ও শিবের গাজন ... পৃ- ১৫-১৮

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ২৬ চৈত্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ৯ এপ্রিল - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে ১৬ এপ্রিল

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৬ এপ্রিল

নববর্ষ সংখ্যার আকর্ষণ : সমাজ জীবনে সঙ্ঘ

ভারতবাসীর কাছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নাম আজ সুপরিচিত। এমনকী ভারতবর্ষের বাইরেও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বিরোধীরাও একান্তে সঙ্ঘের ভূমিকাকে স্বীকার না করে পারেন না। ১৯২৫ সালে নাগপুরে যে ছোট্ট চারাগাছটি বপন করেছিলেন ডাঃ হেডগেওয়ার, মাত্র ৮৭ বছরের মধ্যেই তা সুবিশাল মহীরূহের আকার ধারণ করল কীভাবে? সঙ্ঘের ভাবাদর্শ মাথায় নিয়ে শিক্ষা-স্বাস্থ্য- বনবাসী-শ্রমজীবী-কৃষিজীবী- ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক- সংস্কৃত-বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাদের কাজ মোহিত করেছে দেশবাসীকে? তারই সুলুক সন্ধানে সাজানো স্বস্তিকা'র নববর্ষ সংখ্যা। বাংলা পড়তে জানা প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা।

—: লিখেছেন : —

শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, সত্যনারায়ণ মজুমদার, রবি রঞ্জন সেন, এন সি দে, শক্তিপদ ঠাকুর, বিকাশ ভট্টাচার্য, বিমলকৃষ্ণ দাস, রোহিনীপ্রসাদ প্রামাণিক প্রমুখ।

স্বস্তিকা

নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন

আগামী ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ৫.৩০ টায় কলকাতায় কেশব ভবনে (৯এ, অভেদানন্দ রোড, কলিকাতা — ৬) স্বস্তিকা'র নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান হবে। শুরুতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনায় থাকছেন সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা। স্বস্তিকা'র এবারের নববর্ষ সংখ্যার বিষয় : সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অবদান।

অনুষ্ঠানে স্বস্তিকা'র সকল লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

— স্বস্তিকা পরিবার

আনন্দ সংবাদ

৩৪ পাতার 'স্বস্তিকা' ৪২ পাতায়

আনন্দ সংবাদ

জাতীয়তাবাদী চেতনার নির্ভীক মুখপত্র হিসেবে গত ৬৪ বছর ধরে যে নির্ভীক সংবাদ পরিবেশন করে আসছিলাম আমরা, ইদানীং দেশের সংকটময় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তা যেন আর ৩৪ পাতায় কুলোচ্ছিল না। তার ওপরে নিউজপ্রিন্ট ও ছাপার খরচের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একান্ত অপারগ হয়েই দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু তখন থেকেই পাঠকদের চাহিদা মেনে তাঁদের হাতে নতুন কিছু তুলে দেওয়ার ইচ্ছে গুঞ্জরিত হচ্ছিল 'স্বস্তিকা'র অন্দরে। এরই ফলশ্রুতিতে ৩৪ পাতার 'স্বস্তিকা' রূপান্তরিত হচ্ছে ৪২ পাতায়। মানে আরও বেশি জাতীয়তাবাদী সংবাদ, নির্ভীক প্রতিবেদন, পুরনো বিষয়ে বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি নতুন বিষয়ের ভাবনা, সবমিলিয়ে নবরূপে উপভোগ্য। আগামী নববর্ষ সংখ্যা থেকেই। একই দামে। বিরাট আর্থিক ঝুঁকি নিয়েই 'স্বস্তিকা'কে আরও ঝকঝকে তকতকে করার চেষ্টা হচ্ছে। স্রেফ আপনাদেরই ভরসায়।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

সম্পাদকীয়

সংবাদপত্রে সরকারী ফতোয়া

সরকারী অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগারে কয়েকটি সংবাদপত্র না কেনা লইয়া রাজ্য সরকার যে বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়িয়া সমালোচনার ঝড় বহিতে শুরু করিয়াছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাইয়া বিধানসভা হইতে ওয়াক-আউট করিয়াছেন বিরোধী বিধায়করা। এমনকী জোট শরিক কংগ্রেসও রাস্তায় নামিয়া বিক্ষোভ মিছিল করিয়াছে।

এইসব সংবাদপত্র বাছাইয়ের ভিত্তি হিসাবে সরকারের পক্ষ হইতে কখনও 'মুক্তচিন্তার প্রসার' ঘটানোর, কখনও বা সরকারের আর্থিক অবস্থার, কখনও আবার 'ছোট ছোট কাগজের পাশে দাঁড়ানো সরকারের নীতি'-র কথা বলা হইয়াছে। এইভাবে সরকার নিজেদের অবস্থানের কথা ব্যাখ্যা করায় বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়াছে। এমন একটি বাংলা দৈনিকের নাম সরকারের পছন্দের তালিকায় রাখা হইয়াছে যাহা এখনও প্রকাশিতই হয় নাই। অথচ ওই কাগজটি 'মুক্তচিন্তার' সংবাদপত্র হইবে বলিয়া সরকার ধরিয়া লইয়াছে। সরকারী তালিকায় ইংরেজি দৈনিক 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'কে রাখা হইয়াছে। এই কাগজটি দেশের এক নম্বর ইংরেজি দৈনিক অর্থাৎ ছোট কাগজ নয়, আর্থিকভাবেও পিছাইয়া নাই। গ্রন্থাগারগুলিতে জনপ্রিয় সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির মতো স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের সাফাই গাইতে গিয়া সরকারের, বিশেষত সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীর যে চেহারাটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কি মা-মাটি-মানুষের প্রতিনিধির ? এই প্রশ্নটাই এখন রাজ্যবাসীর কাছে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া কয়েকটি (১৩) সংবাদপত্রকে রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে রাখিবার সিদ্ধান্ত দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নগ্ন প্রচেষ্টা মাত্র। যাহা সম্পূর্ণ বেআইনি ও অসাংবিধানিক। ১৯৭৯ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাক্ট অনুযায়ী এবং ১৯৮১ সালের লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট আইনের রুল ১০-এ গ্রন্থাগার পরিচালনার খুঁটিনাটি তথ্য দেওয়া আছে। সেইসব নিয়মাবলীতে নির্দিষ্টভাবে বলা হইয়াছে, পাবলিক লাইব্রেরিতে কী বই কেনা বা কোন সংবাদপত্র থাকিবে তাহা ঠিক করিবেন পাঠক সমাজ। সরকার উপর হইতে কোনও নির্দেশ সেখানে চাপাইয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশিকার মাধ্যমে সেই প্রচেষ্টাই করা হইয়াছে যাহা স্বাধীন মত প্রকাশের উপর চরম আঘাত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

রাজ্যের যে বিদ্বৎজনেরা আজকের সরকারপক্ষকে মহাকরণে যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এখন তাঁহারাই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। ইতিমধ্যেই সরকারী এই বিজ্ঞপ্তির প্রতিবাদে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হইয়াছে। মুক্তচিন্তার কথা বলিলেও রাজ্য সরকার আসলে নির্লজ্জভাবে দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। সরকারের নির্দিষ্ট তালিকায় স্থান পাওয়া সংবাদপত্রগুলির সহিত সরাসরি যুক্ত রহিয়াছেন তৃণমূল কংগ্রেসের চার-চারজন সংসদ সদস্য।

ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়-পরাজয়টাই গণতন্ত্রের একমাত্র মাপকাঠি নয়; গণতান্ত্রিক মানসিকতা— অন্যের কথা ধৈর্য ধরিয়া শুনিবার ইচ্ছাটাই বড় কথা। রাজ্য-সরকারের আচরণে ইহার বিপরীত চিত্রটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জরুরী অবস্থার কালো দিনগুলি আমরা পার করিয়া আসিয়াছি। সেই সময়েও সংবাদপত্রের 'সেন্সর' চালু হইলেও গ্রন্থাগারে কোন সংবাদপত্র রাখিতে হইবে, তাহা বলা হয়নি। সেইদিন 'স্বস্তিকা' এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সম্প্রতি দূরদর্শনের কয়েকটি চ্যানেলে স্বস্তিকার সেই ভূমিকার বিষয়টি প্রদর্শিতও হইয়াছে। ১৯৯২-এর অযোধ্যায় ধাঁচা ধূলিসাৎ হইবার পর 'স্বস্তিকা' দপ্তরে স্বৈরাচারী বামফ্রন্ট সরকার তালা ঝুলাইয়া দিয়াছিল। স্বস্তিকার প্রবল দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত নিজের ফেলা থুতু নিজেই চাটিতে বাধ্য হইয়াছিল সেদিনের বামফ্রন্ট সরকার। গণতন্ত্রের উপর— স্বাধীন মত প্রকাশের বিরুদ্ধে কোনও রকম আঘাত 'স্বস্তিকা' কখনও সহ্য করে নাই, করিবেও না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমরা দেখিয়াছি, সংস্কারক ও সমালোচকদের কার্যপ্রণালী কিরূপ। তাঁহারা কেবল অপরের দোষ দেখান, সব ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলিয়া নিজেদের কল্পিত নূতন ভাবে নূতন করিয়া গড়িতে যান। আমরা সকলেই নিজ নিজ মনোমত এক-একটা কল্পনা লইয়া বসিয়া আছি। দুঃখের বিষয়, কেহই তাহা কার্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত নহে, কারণ সকলেই আমাদের মতো উপদেশ দিতে প্রস্তুত। তাঁহার (রামকৃষ্ণদেবের) কিন্তু সেই ভাব ছিল না, তিনি কাহাকেও ডাকিতে যাইতেন না। তাঁহার এই মূলমন্ত্র ছিল—প্রথমে চরিত্র গঠন কর, প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাব অর্জন কর, ফল আপনি আসিবে। তাঁহার প্রিয় দৃষ্টান্ত ছিল ঃ যখন পদ্ম ফোটে, তখন ভ্রমর নিজে নিজেই মধু খুঁজিতে আসে। এইরূপে যখন তোমার হৃৎপদ্ম ফুটিবে, তখন শত শত লোক তোমার নিকট শিক্ষা লইতে আসিবে। —এইটি জীবনের এক মহা শিক্ষা।...

—স্বামী বিবেকানন্দ।

পদত্যাগের প্রবণতা বাড়ছে সশস্ত্র বাহিনীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশের সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানরা কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ক্রমাগত স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে চলেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ৪৬,০০০ জওয়ান স্বেচ্ছা-অবসর নিয়েছেন। এছাড়া আরও ৫,২২০ জন জওয়ান এবং অফিসার ২০০৭ থেকে ২০১১-র মধ্যে পদত্যাগ করেছেন। ওই একই সময়সীমার মধ্যে ৪৬১ জন জওয়ানের আত্মহত্যা এবং সহকর্মীদের হাতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে ৬৪টি।

> সশস্ত্র বাহিনীতে জওয়ানরা কাজের মধ্যে সন্তুষ্টি খুঁজে পাচ্ছেন না। একজন কনস্টেবলের হেড-কনস্টেবল পদে উন্নীত হতে ১৮-২০ বছর লেগে যায়। অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ডান্ট হতে ১৫-১৬ বছর লেগে যায়। পরবর্তী উচ্চপদ কম্যান্ডান্ট হতে ৩০ বছর লেগে যায়।

সম্প্রতি দেশের আধা-সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে এই দুঃসহ ছবিটি উঠে এসেছে।

ভি আর এস বা স্বেচ্ছা অবসর, পদত্যাগ, আত্মহত্যা এবং সহকর্মীদের হাতে হত্যার ঘটনাতেই ব্যাপারটা থেমে নেই, অসুস্থতার কারণেও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর ৩,৬০০ জওয়ান বিগত পাঁচবছরে মারা গিয়েছেন। এছাড়াও ১,৪৬৪ জন সি আর পি এফ জওয়ান এবং ৪৭৫ জন বি এস এফ জওয়ান নিহত হয়েছেন গত চার বছরে।

দেশের ছয়টি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে রয়েছে— সি আর পি এফ, বি এস এফ, সশস্ত্র সীমা বল, আই টি বি পি, সি আই এস এফ এবং অসম রাইফেলস্। এখানে এলিট গোত্রের এন এস জি কম্যান্ডোদের কোনও হিসাব নেই। ওঁদেরকে সাধারণত ডেপুটেশনে পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হিসেব অনুসারে বিগত কয়েকবছরে ভি আর এস বা স্বেচ্ছা-অবসর নেওয়ার ঘটনা ভালোমতন বেড়েছে। 'ডসিয়োর' বা তথ্যপঞ্জী থেকে জানা গেছে

পদত্যাগী জওয়ান	
সি আই এস এফ :	১৬৭৯
বি এস এফ :	৯২৪
এস এস বি :	৬৪৬
আই টি বি পি :	৩৫১,
আসাম রাইফেলস :	১৩৭

স্বেচ্ছাবসরের খতিয়ান	
বি এস এফ :	২২,২৬০,
সি আর পি এফ :	১১,৩৯২
আসাম রাইফেলস্ :	৫,৬০১
সি আই এস এফ :	৩,৬১৬
আই টি বি পি :	১,৬৭৩
এস এস বি :	১,৪৩৯
গত পাঁচবছরে মোট : জন অবসর নিয়েছেন।	৪৫,৯৮১

স্বেচ্ছা-অবসর নেওয়ার হিসেবে বি এস এফ-এ সর্বাধিক এবং আই টি বি পি-তে সবচেয়ে কম। দুটো বাহিনীই দেশের সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত। ২০০৭ থেকে ২০১১-এর মধ্যে কর্মজীবনে কুড়িবছর পেরোনোর আগেই স্বেচ্ছা অবসরের দরখাস্ত সর্বাধিক জমা পড়েছে— সি আর পি এফ-এ। এক হাজার চারশ তিরাশিটি। ২০০৭ থেকে ২০১১-র সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল জওয়ানরা পদত্যাগ করেছেন তাদের হিসাবটা নিচের সারণীতে দেওয়া হল :

এই প্রবণতা বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রক মন্তব্য করেছে— সি আর পি এফ এবং বি এস এফ-এর মধ্যে পদত্যাগ প্রবণতা যথেষ্ট সাবধানতার-সূচক। ২০১০ থেকে ২০১১-তে প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম অসম রাইফেলস্— এই বাহিনীতে গত তিনবছরে পদত্যাগের পরিমাণ ও প্রবণতা, দুটোই কমেছে।

স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণের বাহিনী অনুসারে সংখ্যার জন্য : ২০০৭—২০১১ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) সারণী দেখুন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপরোক্ত পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে যে, সরকার কাজের উপযোগী পরিবেশ, সুযোগ সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা ও পরিষেবা দিতে পারছেন না। ফলে, দেশে সশস্ত্র আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ানের সংখ্যা কমছে। অভাব রয়েছে অনুপ্রেরণা প্রদানের এবং পরিবেশেরও। এছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীতে জওয়ানরা কাজের মধ্যে সন্তুষ্টি খুঁজে পাচ্ছেন না। একজন কনস্টেবলের হেড-কনস্টেবল পদে উন্নীত হতে ১৮-২০ বছর লেগে যায়। অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ডান্ট হতে ১৫-১৬ বছর লেগে যায়। পরবর্তী উচ্চপদ কম্যান্ডান্ট হতে ৩০ বছর লেগে যায়। অথচ প্রাইভেট সেক্টরে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে থাকা, পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সুযোগ না থাকা, দাবী-দাওয়া প্রভৃতি অভাব-অভিযোগ সহানুভূতির সঙ্গে দেখার অভাব জওয়ানদের বিপরীত মনোভাবের সৃষ্টি করছে। চাকরিতে স্থিরতা, সুযোগ-সুবিধা, সহজ-সরল কম সময়ে পদোন্নতি এবং জওয়ানদের মানসিক প্রফুল্লতা বিধান একান্তই জরুরী বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

মমতার ইমাম সম্মেলন : নির্লজ্জ মুসলিম তোষণেরই নামান্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা।। অভূতপূর্ব কাজ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদিন গায়ে হিজাব চড়াচ্ছিলেন। ঈদের নামাজে গিয়েছিলেন। মুসলিম মোল্লা-মৌলভিদের সঙ্গে এক মঞ্চে উঠে বক্তৃতা করেছিলেন। এবার বোধ হয়, সে সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে গেলেন তিনি। রাজ্যের ২৫ হাজার ইমামকে নিয়ে সম্মেলনে হাজির হলেন গত ৩ এপ্রিল। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে সরকারি খরচে, সরকারি পরিকাঠামো ভাড়া করে ইমামদের হাজির করানো হলো। ইমামদের বেতন বৃদ্ধি থেকে নানাবিধ প্যাকেজের কথাও থাকল সেখানে। ধর্মনিরপেক্ষ মুখ্যমন্ত্রী এহেন ইমাম সম্মেলন নিয়েও অবশ্য তথাকথিত সেক্যুলারবাদীরা নিশ্চুপ। প্রশ্ন, যদি মুখ্যমন্ত্রী ২৫ হাজার নন, মাত্র জনা পাঁচেক সাধু-সন্তকে ডেকে প্রকাশ্যে নয়, নিজের চেম্বারেও বৈঠক করতেন তখনও কি সেক্যুলারবাদীরা চুপ থাকতেন? না কি মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুত্ববাদী আচরণ করছেন বলে চিৎকার জুড়ে দিতেন? অথচ ইমাম সম্মেলন নিয়ে তোষামোদ করার রাজনীতি নিয়ে রাজ্যের বুদ্ধিজীবী মহল থেকে কোনও রাজনৈতিক দলের মুখেই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না।

শোনা গিয়েছে, সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন করার জন্য ইমামদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেজন্য প্রতিটি জেলার সংখ্যালঘু উন্নয়ন অফিসারদের ইমাম নির্বাচনের ভার দেওয়া হয়েছে। দূর-দূরান্তের ইমামদের আসবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। হাওড়া, শিয়ালদহ, ধর্মতলা থেকে ইমাম সাহেবদের নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়ার এলাহি ব্যবস্থাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যাঁরা আগের দিন চলে এসেছিলেন তাঁদের জন্য হজ হাউস এবং ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি রাখেনি সরকার। সব মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ।

ইমাম সম্মেলন নিয়ে প্রশাসনিক মহলে চরম প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর এভাবে শুধুমাত্র ইমামদের নিয়ে সম্মেলন ডাকতে পারে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সংখ্যালঘু তো শুধু মুসলিমরাই নয়। খৃস্টান, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের কেন ডাকা হল না। তার কোনও জবাব অফিসাররা দিতে পারছেন না। শুধু বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে কাজ হয়েছে। সংখ্যাগুরু বলে কি পুরোহিতদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের কোনও অধিকার নেই।

টোলের পণ্ডিতদের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। তাঁরা কখনও ভাতা পান, কখনও পান না। ইমামদের জন্য প্যাকেজ ঘোষণা হতে পারে, আর টুলো পণ্ডিতদের জন্য, দুঃস্থ পুরোহিতদের জন্য নয় কেন? তাঁরা কি ইমামদের থেকে সামাজিকভাবে ভালো অবস্থায় আছেন? সকলেই বোঝেন সামনে পঞ্চায়েত ভোট। মুসলিম ভোট এককাট্টাভাবে না পেলে মমতার পঞ্চায়েতে জেতা হবে না। তাই মুসলিম প্রধান গ্রামগুলিতে ইমামদের দিয়ে জোড়াফুলের প্রচার করাতে চান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর ধ্যান-ধারণায় রয়েছে, যদি ইমামদের হাতে রাখা যায়, তাহলেই মুসলিম ভোট পেতে কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু তা করতে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিষময় করে তোলার দায়ও তাঁকেই নিতে হবে।

ভারতের বিরুদ্ধে নাশকতা পাকিস্তানের কাছে এক কড়া নেশা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি উপমহাদেশীয় দেশগুলি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য বিপদ ও দেশগুলির ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা সংক্রান্ত সমীক্ষার জন্য গঠিত ওবামা প্রশাসনের প্রতিরক্ষা দপ্তরের সহ-সচিব মাইকল সিহানের বক্তব্য, ভারতের অভ্যন্তরে লাগাতার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানো পাকিস্তানের একটি দুরারোগ্য নেশায় পরিণত হয়েছে। আমেরিকান প্রতিরক্ষা অধিকর্তা বলেছেন, নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে হাতিয়ার করেই ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার তত্ত্বটি নতুন কিছু না হলেও অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর খবরটি হলো অবস্থা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আজ আমেরিকার পক্ষেও পাকিস্তানকে এই রাস্তা থেকে সরানো সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, "ভারতে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তৈরি বা তাতে লাগাতার মদত দেওয়া পাকিস্তানের কাছে এক উত্তেজক নেশার মতো। এ থেকে বেরোনোর লক্ষণ নেই। তাঁদের কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হলেও এই কাণ্ডই তাদের যত সমস্যার মূল।" আমেরিকান সেনেটের অন্যান্য প্রতিনিধিদেরকে তিনি জানান, "এই কৌশল থেকে পাকিস্তানকে নিরস্ত করতে আমরা হয়ত আমৃত্যু আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি। তবে আমাদের কখনও সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমার মনে হয় না। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের কোনও কূটনীতিকও যে ইতিবাচক কিছু করতে পারবে, এমনটাও আমি আশা রাখি না।"

সম্প্রতি আমেরিকান সামরিক অধিকর্তাদের সঙ্গে পাকিস্তানী সামরিক কর্তাদের চলা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ফলাফল প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সিহান ক্ষোভের সঙ্গে জানান— দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে মার্কিন-পাক আলোচনায় দু'দেশের সুসম্পর্ক বজায় রাখার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। আমেরিকান পার্লামেন্টারি কমিটিকে দেওয়া আমেরিকা-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ক রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি আরও জানান, পাকিস্তানের তরফে দেওয়া নতুন কয়েক দফা দাবীকে মাথায় রাখলে আমেরিকার পক্ষেও সে দেশের (পাকিস্তানের) সরকারের সঙ্গে কাজ করাটা কঠিন হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য, যা আলোচনার পরেও আমেরিকা নিজের উদ্দেশ্যসাধনে পাকিস্তানের মাটিতে প্রয়োজন মতো ড্রোন আক্রমণ চালিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করে নিচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, ভারত কি শুধু আতঙ্কবাদের নিরীহ শিকার হয়েই থাকবে?

তৃণমূল নেত্রীকে বিভ্রান্ত করছেন স্তাবকের দল

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতার স্তাবকবৃন্দ বড় গলা করে প্রচার শুরু করেছেন যে 'মুখ্যমন্ত্রীর কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে'। বাধা দিচ্ছে মিডিয়া। মিডিয়া সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'চক্রান্ত' করছে। নন-ইস্যুকে সামনে এনে উন্নয়নের কর্মসূচিগুলিকে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়া কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, শস্যবিমা চালু করে দিয়েছেন। মিডিয়া তার প্রচার করছে না। উল্টে ঋণের ফাঁদে পড়ে কৃষকের আত্মহত্যার আজগুবি গপ্‌পো প্রচার করছে। রেল দফতর তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালনা করে। তাই রেলের খাবারে আরশোলা, এসি অচল, কামরায় সাফাই হয় না, সব ট্রেনই দু' চার ঘণ্টা লেট চলে ইত্যাদি প্রচার চালানো হচ্ছে। এমন কথাও মিডিয়া বলছে যে কলকাতায় মহাকরণে বসে মমতা রেল দফতর চালাচ্ছেন। মুকুল রায় মমতার শিখণ্ডী রেল মন্ত্রী। দীনেশ ত্রিবেদী শিখণ্ডী হতে রাজি ছিলেন না। ফলে বরখাস্ত হয়েছেন। অর্থাৎ, রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ার মানবিক, দরদী, উন্নয়নমুখী কর্ম সংস্কৃতিকে আড়াল করতেই মিডিয়া লাগাতার অপপ্রচার চালাচ্ছে। দেশের মানুষের মনে মমতার যে 'মমতাময়ী' ইমেজ গড়ে উঠেছে তা নষ্ট করতেই পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়া আদা জল খেয়ে লেগে পড়েছে।

কিন্তু মমতাময়ীর স্তাবকেরা যে প্রশ্নটি প্রাণপণে আড়াল করতে চাইছেন তা হলো, মিডিয়া বা মিডিয়ার একাংশ নেত্রীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছে কেন? চক্রান্তকারী মিডিয়া মাত্র ছ' মাস আগেও মমতার প্রশংসায় বিগলিত ছিল। হঠাৎ কেন পালটে গেল মতটা, বদলে গেল পথটা। যে সব শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এতকাল দরাজ হাতে মমতাকে ঢালাও সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাঁরা এখন কেন সেভাবে সমর্থন করতে পারছেন না? বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা নেত্রীর মানসিক অস্থিরতাকে গণতন্ত্রের পক্ষে অমঙ্গলজনক বলছেন। নেত্রীর মধ্যে তাঁরা জার্মানির নাৎসী একনায়ক হিটলারের ছায়া দেখে ডরাচ্ছেন। ভয়ের যথেষ্ট কারণও আছে। নেত্রী বলেছেন, তাঁর সরকারের সমালোচনা বন্ধ না করলে তিনি 'চক্রান্তকারী' সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলগুলি বয়কট করার জন্য মা-মাটি-মানুষকে ডাক দেবেন। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এতো ঘোর বিপদের কথা। সিপিএমের তিন দশকের রাজত্বে এক শ্রেণীর দলদাস চক্র গড়ে উঠেছিল। মিডিয়া এই দলদাস প্রথার সাধ্যমত বিরোধিতা করেছে। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর কাণ্ডের পর মিডিয়াই পার্টির দলদাসদের 'হার্মাদ' বলে প্রথম চিহ্নিত করে। পার্টির ডাকাবুকো লড়াকু কমরেডদের 'হার্মাদ' সম্বোধন করার জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাই প্রয়াত সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্তকে জেলে পুরবেন বলে হুমকি দেন। অন্য একজন বাহুবলী সিপিএম মন্ত্রী 'বর্তমান' খবরের কাগজের অফিস গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার কথাও সগর্বে বলে বেড়াতেন। রাজ্যের পরিবর্তিত নতুন মুখ্যমন্ত্রী তখন প্রতিটি মিটিং, মিছিল, শ্লোগানে হার্মাদ তাড়ানোর ডাক

গূঢ়পুরুষের

কলম

দিতেন। সিপিএমের অত্যাচারে, অবহেলায়, অপমানে জর্জরিত বাংলার মানুষ নেত্রীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। ব্যালটের শক্তিতে বাংলার মসনদ থেকে হার্মাদদের তাড়িয়ে ছিলেন। পুরো একটা বছরও যায়নি। মানুষ এখন বুঝেছেন, হার্মাদ তাড়িয়ে তাঁরা মহাকরণের মসনদে উন্মাদ বসিয়েছেন। এমনই ব্যক্তি যিনি মহাকরণে বসে ঠিক করে দেন, এবার রেল বাজেটে নতুন ট্রেনের সঙ্গে একেবারে ফ্রি নতুন রেলমন্ত্রী দেওয়া হবে। ভারতীয় রেলের ইতিহাসে এমন উপহারের দ্বিতীয় নজির নেই। তৃণমূল নেত্রীকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর চারপাশের ঘিরে থাকা স্তাবকের দল। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্তাবকেরা নেত্রীর পদকে ব্যবহার করছেন। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত লাইব্রেরিতে মানুষ কোন কোন খবরের কাগজ পড়বেন এবং কোন কাগজ পড়বেন না স্তাবকেরাই ঠিক করে দিচ্ছেন। নেত্রী পরে স্তাবকদের পিঠ চাপড়ে বলছেন, বহুত আচ্ছা। ভাল কাজ। ওয়েল ডান। নেত্রী ধরেই নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষ তাঁর খাস তালুক। তাঁর খাস তালুকের প্রজাদের ভাল মন্দ বিচার তিনিই করবেন। সাধারণ মানুষ নিজেদের ভাল মন্দ বোঝে না। মানুষকে বোঝাতে হয়। তাই পরিবর্তনের সরকারের বিরুদ্ধে মিডিয়ার চক্রান্তের ব্যাপারটা ঢাক পিটিয়ে জানাতে হচ্ছে। স্পষ্ট করেই বলতে হচ্ছে যে তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করলে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে হবে। এই রাজ্যে বাস করতে হলে দিবারাত্র নেত্রীর নাম কীর্তন করতে হবে। হ্যাঁ, সবিনয়ে স্বীকার করছি এতটা খোলাখুলি ভাবে মিডিয়াকে শায়েস্তা করার পথে হাঁটতে বুদ্ধদেববাবুরা সাহস করেননি। জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রয়াত কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সংবাদপত্রকে ডান্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার নীতি নিয়ে ছিলেন। সফল হননি। সংবাদপত্র নতজানু হয়নি। সিদ্ধার্থবাবুকেই পালাতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত, একটা কথা মনে করিয়ে দিই, তৃণমূলের নির্বাচিত ১৮৪ জন বিধায়কের মধ্যে ৬৯ জনের বিরুদ্ধেই চলছে গুরুতর ফৌজদারি মামলা, শতাংশের বিচারে তা ৩৮ শতাংশ। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ১২৬৩ জন প্রার্থীর হলফনামা পর্যবেক্ষণ করেই এমন রিপোর্ট তৈরি করেছে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই প্রতিবেদনে দেখা যায়, বর্তমান বিধানসভায় ৩৫ শতাংশ বিধায়কের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা চলছে। এ রাজ্যে অভিযুক্ত বিধায়কদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট প্রার্থীরাই। অভিযুক্তদের অন্যতম তৃণমূল বিধায়ক অর্জুন সিং। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৬২টি ধারায় ১৪টি মামলা রয়েছে। আছে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গুরুতর মামলাও। বর্ধমানের কেতুগ্রাম থেকে তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছেন শেখ শাহনয়াজ। তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৪টি গুরুতর ধারায় অপরাধের অভিযোগ। রয়েছে দুটি খুনের মামলা (৩০২) এবং তিনটি খুনের চেষ্টার মামলা (৩০৭)। নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদেরই দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার যে ৯ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে রয়েছে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ তাঁরা হলেন মলয় ঘটক (আইন ও বিচার বিভাগ) ফিরহাদ হাকিম (পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর), রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (কৃষি দপ্তর), সুব্রত মুখোপাধ্যায় (পঞ্চায়েত), জাভেদ আহমেদ খান (দমকল, অসামরিক প্রতিরক্ষা ও বিপর্যয় মোকাবিলা), শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় (শিশু কল্যাণ), মদন মিত্র (ক্রীড়া দপ্তর), শান্তিরাম মাহাতো (স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর), আব্দুল করিম চৌধুরী (জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার)। তাই বলছি, পরিবর্তনের জোয়ারে ভেসে রাজ্যের মানুষ সিপিএমের হার্মাদদের তাড়িয়ে কাদের ক্ষমতায় এনেছেন ভেবে দেখা দরকার।

বুদ্ধবাবুর স্বেচ্ছাচারিতার পথেই চলেছেন মমতা

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে 'কুনাট্য' মঞ্চস্থ হচ্ছে। প্রথম যে ঘটনাটি জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা হলো সরকারি অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগারে কোন কোন দৈনিক সংবাদপত্র থাকবে তার নির্দেশিকা নিয়ে। নির্দেশিকায় বর্তমান সরকারের পোষ্য পত্রিকার অনুমোদন যে থাকবে তা তো বলাই বাহুল্য! এছাড়া যেসব সংবাদপত্র অন্ধস্তাবক তারাও সরকারের প্রসাদপ্রাপ্ত। এমন একটি পত্রিকাকে তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশে বাদ দেওয়া হলো— যারা তৃণমূল নেত্রীকে জনসাধারণ-এর সামনে তুলে ধরার জন্য সিপিএম-কে বছরের পর বছর সমালোচনার তীব্র কষাঘাত করে গেছেন। এই ঘটনায় সংস্কৃত ভাষায় একটি উপাখ্যান-এর কথা মনে আসছে— একটি কাকের মুখ থেকে পড়ে যাওয়া এক মূষিককে একজন ঋষি যত্ন করে বাঁচিয়ে তাকে তারই অনুরোধে সিংহে পরিণত করেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে সিংহরূপী মূষিকের মনে হয়েছিল যে যতদিন এই ঋষি বেঁচে থাকবে ততদিন তার পশুরাজ হওয়ার কোনও মূল্য থাকবে না। তাই সেই সিংহরূপী মূষিক ঋষিকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলে ঋষি তাঁর মন্ত্রপুত জল ছিটিয়ে ''পুনর্মূষিকঃ ভব'' বলেছিলেন। শঙ্কিত সংবাদপত্রগুলি হলো সেই ঋষিকুল যাদের প্রচারের আলোতে নেত্রী আলোকিত হয়েছিলেন। সেই আলোক নিভিয়ে দিলে অচিরাৎ নেত্রী নিষ্প্রভ হয়ে যাবেন।

সরকারের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন তাঁরা, যাঁরা একদিন নেত্রীকে সমর্থন করে সিংহাসনে বসার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা ধীরে ধীরে 'নেত্রী' তথা নেত্রীর সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। 'নেত্রী' যে গণতন্ত্রের পক্ষে নন তা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁকে অনেকে দলতন্ত্রের পুরোধা বলে অভিযোগ করেন। কিন্তু সেটা ভুল। আসলে তিনি গোষ্ঠীতন্ত্রের পোষক। নেত্রীর দলে একমাত্র স্তাবকগণই স্নেহধন্য হয়েছেন। যে সংবাদপত্রগুলিকে সরকারি অনুমোদনের তালিকায় রাখা হয়েছে তাঁদের মধ্যে তিনটি সংবাদপত্রের কর্মকর্তা তথা সাংবাদিকদের রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন এক সময়ে তৃণমূলের নেত্রী বলেছিলেন, 'অর্পিতাকে আমি দিল্লীতে নিয়ে যাব।' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন রাজ্যসভার 'ধারণা'টা এসেছে বৃটিশের হাউস অফ লর্ডস থেকে। এতদিন পর্যন্ত রাজ্যসভাকে প্রজ্ঞাবানদের সভা মনে করা হোত। আজ কি দেখা যাচ্ছে? যাঁদের কোনও রাজনৈতিক পটভূমি নেই, কোনও বিশেষ ক্ষেত্রের গুণীজন নন, কেবলমাত্র মমতার স্তাবক— এই গুণসম্পন্ন হয়েই রাজ্যসভায় স্থান লাভ।

আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমালোচনা সহ্য করতে চান না, তাই সিপিএম শাসকের মতোই বলেন, '১০ বছর চুপ করে থাকুন।' মুখ্যমন্ত্রী

বলেছেন তাঁদের প্রতিশ্রুতি মতো সব কাজ হয়ে গেছে! এদিকে জনগণনার রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ আর্থসামাজিক উন্নয়নে পিছনের সারিতে। গৃহস্থের মৌলিক পরিষেবা দিতে রাজ্য ব্যর্থ। এদিকে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্স অন এন্ট্রি অফ গুডস টু লোকাল এরিয়াজ বিল ২০১২' গৃহীত হলে পণ্যে প্রবেশ কর বস্‌বে। পণ্যের দাম বাড়বে, বোঝ চাপবে সাধারণ- মানুষের ঘাড়ে! অথচ গত চার মাস ধরে ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকা কাজে না লাগিয়ে পড়ে রয়েছে!

নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগণা এই তিনটি জেলার জেলা পরিষদের আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিঙের জিটিএ-কে সমতলে এলাকা দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে মহাকরণে মমতা-মোর্চার আলোচনা নাকি ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু বিধানসভায় সেই আলোচনার ফলাফল জানানো হয়নি। ঠিক বুদ্ধদেববাবুর মতো নিজেই সব করবেন, কাউকে জানতে দেবেন না। মমতাদেবী ভুলে যাবেন না— বুদ্ধদেববাবুর অবস্থা এখন কি হয়েছে!

ঋণের দায়ে চাষিরা অনবরত আত্মহত্যা করে চলেছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে তুলে দেবার ব্যবস্থা করে গ্রামের হাঙর মহাজনের হাতে চাষিদের ঋণ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বন্দিমুক্তি কমিটি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে— বন্দিমুক্তির ব্যাপারে তৃণমূল নেত্রী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। যৌথবাহিনী প্রত্যাহার হয়নি। একদিকে এন সি টি সি-র সকল ধারাই ইউ-পি এ আইনে চলেছে। এই আইনে গ্রেপ্তার করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে পেশ করা হচ্ছে না।

ধর্মঘটের দিনে অনুপস্থিতিদের বেতন কাটা, চাকরীর মেয়াদের একদিন কাটা শুরু হয়ে গেছে। মমতা ঠিকই বলেছেন, ''ওরা ৩৪ বছরে যা পারেনি তা আমি এক বছরে করে ফেলেছি''! মগজধোলাই, তাঁর হুকুমদারিতে 'মুক্ত' মননের ফতোয়া, নির্বাচিত সংস্থাকে ভেঙে দেওয়া এসবই অ্যাডলফ হিটলার, মুসোলিনী করেছিলেন— একথা তৃণমূল সাংসদ কবীর সুমন টিভি চ্যানেলে বলেছেন। কলকাতা পুরসভার আর্থিক ভাণ্ডার শূন্য। টাকা খরচের উপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে— বরাদ্দ ব্যয়ের ৭০ ভাগের বেশি খরচ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুমোদিত সংবাদপত্রের মধ্যে একটি মজাদার ঘটনা হলো— এমন একটি দৈনিক-কে অনুমোদন দেওয়া হলো সেই দৈনিকটি আসলে 'বুদ্ধ-ভক্ত'। এই কাগজকে যে অনুমোদন দেওয়া হবে তা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ এই দৈনিকের সল্টলেক অফিসে গিয়ে মমতা মুড়ি-বেগুনি- তেলেভাজা সহযোগে জলযোগ এবং চা-পান করে এই সংবাদপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে দু' ঘণ্টা গোপন আলোচনা করেছিলেন।

একদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক সাহায্য না করার অভিযোগ করছে। অথচ কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকা যে খরচ করতে পারেনি তার তালিকা হলো—

(১) স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণে—৭৫ কোটি টাকা, (২) পুলিশ প্রশিক্ষণ— ১৭.৪৪ কোটি টাকা, (৩) পুলিশ-আবাসন— ২৫.৮৭ কোটি টাকা, (৪) নদীবাঁধ নির্মাণ— ১১২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, (৫) অগ্নি নির্বাপক পরিকাঠামো— ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, (৬) অঙ্গনওয়াড়ি নির্মাণ— ৩১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে স্বাস্থ্য এবং অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার টাকা খরচ করতে না-পারাটা একটা মারাত্মক অপরাধ। মমতা বুদ্ধদেবের পোকাকাটা জুতোয় পা-গলিয়ে চলেছেন নিজের জনপ্রিয়তার মদগর্বে।

ফিন্‌সের সেমিনারে ইন্দ্রেশকুমার

উপাসনা পদ্ধতির বদল হতে পারে জাতীয়তা নিয়ে কোনও সমঝোতা হয় না

হলদিয়া থেকে ফিরে বাসুদেব পাল॥ 'রাষ্ট্র (নেশন বা জাতি), রাষ্ট্রীয়তা এবং জাতীয়তাবাদ জাত-পাত, ভাষা, ধর্মের উপর নির্ভর করে না, জন্মস্থানের গৌরব এবং জন্মভূমির উপর নির্ভর করে। যা মানুষ নিজে থেকে ঠিক করতে পারে না, ঈশ্বর বা ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট। আমরা কে কোথায় জন্ম নিয়েছি তা আমাদের পছন্দমাফিক নয়। ১৯৪০-এ যে ঢাকায় জন্মেছে তার দেশগত পরিচয় তিনবার বদল হয়েছে। প্রথমে ভারতীয়, পরে (১৯৪৭-র পর) পাকিস্তানী এবং ১৯৭১-র পর বাংলাদেশী। হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয়ও হতে পারে। ভারতবর্ষ এক দেশ, উপমহাদেশ নয়।"

উপরোক্ত বক্তব্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্য এবং ফোরাম ফর ইন্টিগ্রেটেড ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি (FINS)-র মার্গদর্শক ইন্দ্রেশকুমারের। তিনি সম্প্রতি গত ৩০-৩১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সফর করেন এবং চুঁচুড়া ও হলদিয়ায় FINS-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা কর্তৃক আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন।

ইন্দ্রেশজী আরও বলেন, ইংরেজরা সাতবার ভারতবর্ষকে ভাগ করেছে। হিমালয় পর্বতমালা যেখানে দু'বাহু প্রসারিত করে সাগরের সঙ্গে মিশেছে তার পুরোটাই কোনও এক সময়ে ভারতবর্ষ বা আর্যাবর্ত বা হিন্দুস্থান নামে পরিচিতি ছিল। সেখানে বর্তমানে ৫৬টি দেশ বর্তমান। জাতীয়তাবাদ বা রাষ্ট্রবাদ নিয়ে, কোনও সমঝোতা বা বোঝাপড়া হয় না।

চুঁচুড়ায় ফিন্‌সের মঞ্চে ইন্দ্রেশকুমার (বক্তব্যরত), তাঁর ডান দিকে তথাগত রায় ও প্রদ্যুৎ মৈত্র। বাঁ দিকে অজিত বিশ্বাস ও বিপুল রায়।

১৯৪৭-এর পর রাষ্ট্রজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয়তার ভাবনা ক্রমশই ক্ষীয়মান হয়ে চলেছে। যার ফলে দুর্নীতি থেকে অনুপ্রবেশ-এর মতো ভয়াবহ বিপদজনক ঘটনা ঘটে চলেছে। আমরা চাইলেই মাতৃভূমি, পূর্বপুরুষ বা পরম্পরা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারি না। পূর্ব থেকেই ঈশ্বর নির্দিষ্ট।

এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রেশজী বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনবসতির রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ দেন। যেখানে রামনবমী জাতীয় উৎসব। জাকার্তা শহরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ২৬ ফুট উঁচু বীর হনুমান মূর্তি এবং দেশের কারেন্সি নোটে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি মুদ্রিত রয়েছে। ধর্ম বা উপাসনা পদ্ধতি বদল হলেও জাতীয়তাবাদ, পরম্পরার বদল হয়নি। সেমিনারের অন্যতম বক্তা বিশিষ্ট সাংবাদিক ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী বলেন, FINS সেমিনারের মাধ্যমে দেশজুড়ে সার্বিক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে সচেতন করার কাজ করছে।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথাগত রায়, বিপুল রায় (সহ-সভাপতি, FINS), রাজ্যশ্রী চৌধুরী, হলদিয়াস্থিত কোস্টগার্ডের ডেপুটি কম্যান্ডান্ট অমিতাভ দাস, অ্যাডভোকেট মতিলাল খাটুয়া, সেনকো জুয়েলারি'র অধিকর্তা জীবন সেন, রম্যজ্যোতি ঘোষ এবং ডঃ লেখা শ্রীবাস্তব প্রমুখ।

চুঁচুড়ার সভায় প্রায় দেড়শ জন এবং হলদিয়ায় দুশোর বেশি মানুষ (বেশির ভাগই যুবক) ধৈর্যসহকারে বক্তব্য শোনেন এবং প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করেন।

হলদিয়ায় ফিন্‌সের অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী। —ছবি : বাসুদেব পাল

কেন্দ্রীয় বাজেটে কোনও দিশা নেই আছে শুধুই আশঙ্কা

এন সি দে

১৯৪৭ সালের পর থেকে কংগ্রেস এদেশের মানুষের কাছে বার্ষিক বাজেটকে ব্যবসায়ীর খাতার মর্যাদার উর্ধ্বের আসনে বসাতে পারেনি অথবা বসায়নি। ব্যবসায়ীর খাতায় যেমন সততার ছিঁটে ফোঁটাও থাকে না, কংগ্রেসী বাজেটেও তেমনি সততার ছিঁটে ফোঁটাও থাকে না। ব্যবসায়ীর যেমন সাদার পিছনে কালো খাতাও থাকে, কংগ্রেসী বাজেটের সামনে পিছনে থাকে আরও "Hidden Agenda" (লুকানো এজেন্ডা)। কংগ্রেসী রেল বাজেটের আগেই যেমন বাড়ানো হয়েছিল রেলে পাঠানো পণ্যের উপর মাশুল; ঠিক তেমনি ভাবেই সাধারণ বাজেটের আগেই বাড়ানো হয় বিভিন্ন দ্রব্যের দাম, প্রশাসনিক নির্দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর সম্পদের উপর নানান ধরনের খবরদারি করা হয়; আবার বাজেটের পরেও আস্তিনের নীচে লুকিয়ে রাখা জনগণের মারণাস্ত্র হঠাৎই বার করা হয়। এবার অবশ্য বাজেট পাশ করানো পর্যন্ত অপেক্ষা করারও ফুরসৎ করেননি কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রী। বাজেট পেশের পরদিন থেকেই স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বলতে শুরু করেছেন যে পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসের দাম খুব শীঘ্রই বাড়াতে চলেছেন সরকার। দেখুন কী কাণ্ড! তাহলে আর ঘটা করে বাজেট পুজো করা কেন?

একথার উত্তর অবশ্য অর্থমন্ত্রী এবার আর চেপে রাখতে পারেননি। তিনি বলেই দিয়েছেন বাজেট কেবল আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা ছাড়া আর কিছু নয়। ওই মাড়োয়ারির গদির খাতাবাবুর কাজ যেমন আর কি! পাড়ার সরস্বতী পুজোর হিসাব দাখিল করা যেমন আর কি! তবে তারাও আয় ও ব্যয়ের হিসাবটা ঠিক মিলিয়ে দেয়। কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রীর সে দায়ও নেই, কারণ ঘাটতি হলেই ভালো, তাহলে বিদেশ থেকে ঋণ নিতে পারবে; সেই অজুহাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করতে পারবে। দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস নেতা-নেত্রীদের তৈরি অতল গহ্বরে সেই অর্থ যে তলিয়ে যাবে না তারই বা কী গ্যারান্টি! তা না হলে একটি শক্তপোক্ত ছিদ্রহীন লোকপাল বিল পাশ করতে এই কংগ্রেসীদের এত গড়িমসি কেন?

অর্থমন্ত্রী তাই এবার সোজাসুজিই ফাঁস করে দিয়েছেন চাপে পড়ে যে বাজেট তো শুধু আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল, এটাতে কিছু করা যায় না। আর্থিক সংস্কারের (আসলে আর্থিক সৎকারের) কাজটা করতে হবে অন্য সময়ে ধীরে ধীরে (অর্থাৎ গোপন নির্দেশে)। 'আর্থিক সংস্কার' সব সময় গোপনে করতে হয় কারণ তা জনবিরোধী। দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিরা ও তাদের পোষ্য অর্থনীতিবিদরা এই সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করেন। কারণ দৃশ্যতই তাতে তাদের লাভ বেশি। যেমন সরকারি সংস্থার শেয়ার দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া, বেসরকারি সংস্থাগুলোতে যাতে বিদেশী কোম্পানীগুলো ঢুকতে পারে তার জন্য আমাদের দেশের শেয়ার বাজারের দরজা বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজি (FDI) লগ্নি করার জন্য খুলে দেওয়া, দেশের বাজারে সহজে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিতে অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সুদের হার কমাতে বাধ্য করা; শ্রমিক-দরদী শ্রম আইনগুলো তুলে দিয়ে দেশের শ্রমিকদের বিদেশী মালিকদের গোলামে পরিণত করা— এসবই হলো তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচীর ভ্যারেন্ডা।

এতগুলো কথা বলার একটিই উদ্দেশ্য : তা হলো এই বাজেটের সদর্থক দিক বলে কিছু নেই, যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। একটি বিষয় নিয়েই কেবল কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রী বিব্রত বোধ করেন, সেটি হচ্ছে বাজপেয়ী সরকারের বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের বাধ্যবাধকতা আইন Financial Responsibility & Budget Management (FRBM) Act। বিজেপি-জোট ক্ষমতায় আসার আগে কংগ্রেস লাগামহীনভাবে ঘাটতি বাজেট পেশ করত। FRBM Act ধীরে ধীরে ঘাটতি শূন্য শতাংশে নিয়ে যেতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর উপর আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করায়, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার না চাইলেও রাজকোষ ঘাটতি কমানোর একটা নাটুকে প্রতিশ্রুতি সব বাজেটেই করে থাকে। কিন্তু আদৌ পালন করে না। গত বছর বাজেটে রাজকোষ ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ৪.৬ শতাংশ, আর ২০১২-১৩ বর্ষের বাজেটের ঘাটতির লক্ষ্যও গত বছরেই স্থির করে দেওয়া

'আর্থিক সংস্কার' সব সময় গোপনে করতে হয় কারণ তা জনবিরোধী। দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিরা ও তাদের পোষ্য অর্থনীতিবিদরা এই সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করেন। কারণ দৃশ্যতই তাতে তাদের লাভ বেশি। যেমন সরকারি সংস্থার শেয়ার দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া, বেসরকারি সংস্থাগুলোতে যাতে বিদেশী কোম্পানীগুলো ঢুকতে পারে তার জন্য আমাদের দেশের শেয়ার বাজারের দরজা বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজি (FDI) লগ্নি করার জন্য খুলে দেওয়া, দেশের বাজারে সহজে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিতে অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সুদের হার কমাতে বাধ্য করা; শ্রমিক-দরদী শ্রম আইনগুলো তুলে দিয়ে দেশের শ্রমিকদের বিদেশী মালিকদের গোলামে পরিণত করা— এসবই হলো তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচীর ভ্যারেন্ডা।

হয়েছিল ৪.১ শতাংশ। কিন্তু গত বছরের (২০১১-১২) শেষেই দেখা গেল রাজকোষ ঘাটতি ৪,১২,৮১৭ কোটি টাকা (জিডিপি ৪.৯ শতাংশ) থেকে বেড়ে হয়ে গেছে ৫,২১,৯৮০ কোটি টাকা (৫.৯ শতাংশ)। এছাড়াও রয়েছে রাজস্ব ঘাটতি, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি, জিডিপি ঘাটতি তো আছেই। এবারের বাজেটে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩,৫০,৪২৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৪ শতাংশ), কিন্তু বছরের শেষের দিকে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৯৪, ৯৫১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ)। ৩১ মার্চ '১২ পর্যন্ত পুরো বছরের (২০১১-১২) প্রকৃত হিসাব প্রকাশিত হলে বোঝা যাবে প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি কোথায় পৌঁছেছে। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি বেড়ে হয়ে গেছে জিডিপি'র ৩.৬ শতাংশ; বাণিজ্য ঘাটতি পৌঁছেছে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এসবই আপাতত হিসাব। ৩১ মার্চ, ২০১২ (১১-১২ বর্ষ) পর্যন্ত প্রকৃত হিসাব এলে এই অঙ্ক আরও বাড়বে।

এবার দেখা যাক এবারের (২০১২-১৩ আর্থিক বছর) বাজেটের ধার্য করা সমস্ত লক্ষ্যমাত্রার দিকে। রাজকোষ ঘাটতি (Fiscal Deficit) ধরা হয়েছে ৫,১৩,৫৯০ কোটি (জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ)। গত বছর (২০১১-১২) ধরা হয়েছিল ৪,১২,৮১৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৬ শতাংশ), ছ-মাস যেতে না যেতেই এই লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে করা হলো ৫,২১,৯৮০ কোটি (জিডিপি'র ৫.৯ শতাংশ)। ৩১-৩-১২ পর্যন্ত এই লক্ষ্যমাত্রা যে ঠিক থাকবে তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাহলে ২০১২-১৩'-র লক্ষ্যমাত্রা (৫.১ শতাংশ) স্থির করা হলো কিসের ভিত্তিতে? তার দিশা এই বাজেটে নেই। আছে শুধুই আশঙ্কা। রাজকোষ ঘাটতি বলতে বোঝায় রাজস্ব সংগ্রহ খাতে আয় + ঋণ ফেরত খাতে আয় + অন্যান্য খাতে আয় থেকে মোট ব্যয়ের অংক বাদ দিলে যা থাকে তাই। এবারের বাজেটের রাজস্ব ঘাটতি দেখানো হয়েছে, ব্যয় কমানোর লক্ষণও নেই, শুধু খাদ্য, সার ও পেট্রলিয়ামে ভর্তুকি গতবারের মতো এবারেও কমানোর কথা বলা হয়েছে। গতবার (২০১১-১২) ধরা হয়েছিল ১,৩৪,০০০ কোটি টাকা, পরে সংশোধন করে লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছিল ২,৯০,০০০ কোটি টাকা। এবারেও আবার ঘটা করে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১,৮০, ০০০ কোটি টাকা, নিশ্চিত এই সংখ্যাও সংশোধন করা হবে। তা না হলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেই পেট্রল, ডিজেল ও গ্যাসের দাম বাড়াতেই হবে। আর এগুলোর দাম বাড়লেই অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বাড়বে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাবে না। এমনিতেই উৎপাদন শুল্ক ও পরিষেবা কর (Excise Duty ও Service Tax) দুই শতাংশ শুধু বাড়িয়েই দেওয়া নয়, এই করের আওতায় আনা হয়েছে প্রায় ১৫০টি ক্ষেত্রকে, গত বাজেটে (২০১১) আনা হয়েছিল ১১৯টি ক্ষেত্রকে। উৎপাদন শুল্ক ২ শতাংশ বৃদ্ধি করার ফল আমরা কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পাব। মুদ্রাস্ফীতির বহর আরও বাড়বে। তবে মুদ্রাস্ফীতির একটা সুবিধে হলো সরকার বর্তমান হারে আর্থিক বৃদ্ধিকে বাড়িয়ে দেখাতে পারবে। এইসব কারণে স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ডাইরেক্টর ধনপতরাম আগরওয়াল বলেছেন দেশ '৯০-'৯১ সালের আর্থিক দুরবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। বরং বেকার সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, শেয়ার বাজার ও মুদ্রা বাজারে অস্থিরতা দেশকে আরও বড় সংকটের দিকে নিয়ে চলেছে। যতদিন যাবে এই সরকার আর্থিক সংকট থেকে বাঁচতে নতুন নতুন দেশীয় শিল্পের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে মুমূর্ষু করে তুলবে। যেমন করেছে স্বর্ণ শিল্পকে। গত তিন মাসে সোনার উপর বিভিন্ন স্তরে আমদানি শুল্ক, উৎপাদন শুল্ক ও পরিষেবা কর বাড়ানো হলো। গত জানুয়ারিতে ১ কেজি সোনা আমদানি করতে যেখানে ৩০,৯০০ টাকা শুল্ক দিতে হোত, এই বাজেটের পর তা বেড়ে হবে ১,১৫,০০০ টাকা। সোনার কর ও মুদ্রায় আমদানি শুল্ক প্রায় দ্বিগুণ (৩ শতাংশ) করা হলো। পুরনো গয়না গলিয়ে ৯৯.৫ শতাংশ কম খাঁটি গয়নার উপর দিতে হবে ১-৫ শতাংশ উৎপাদন শুল্ক। এই নিয়ে সব মিলিয়ে ৭.৩০ শতাংশ বাড়তি কর চাপলো স্বর্ণশিল্পের উপর। ভারতের সবচেয়ে সামাজিক সুরক্ষাকেন্দ্রিক শিল্পকে সরকার আজ এভাবেই ধ্বংস করতে চলেছে।

এবার ভারতবর্ষে ‘লাহোর’

অতিথি কলম

মুজফ্‌ফর হোসেন

‘‘হিন্দুস্থানে লাহোর’’— এটি পাকিস্তানে বহুল প্রচারিত দৈনিক ‘ডন’ পত্রিকার একটি প্রবন্ধের শিরোনাম। যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনামেই পাঠকরা চমকে গেছেন। পাকিস্তানের আমজনতা এনিয়ে কোনও অভিযোগ করেনি। তা’বলে পাক-সরকার কীভাবে এই দুঃসাহস মেনে নেবে! ভারতবাসীরাও কিন্তু সন্তুষ্ট নন ওই শিরোনামে।

একটা সময়ে ভারতবর্ষের আম জনতা মর্যাদাপুরুষোত্তম রামচন্দ্রের পুত্র ‘লব’-এর নামে গড়ে ওঠা ‘লাহোর’ শহরের প্রতি লালায়িত হোত। এই স্মৃতিটুকুই— তার বেশি নয়।

লাহোরের পটভূমি :

সকলেই আশ্চর্য হচ্ছেন এই ভেবে যে, এতদিন বাদে ‘লাহোর’ আবারও ভারতে আসছে নাকি! সারা পৃথিবী একথা শুনছে আর তা নিয়ে পাক-পত্র-পত্রিকা পাতা ভরাচ্ছে। তবে ভারতে ‘লাহোর’ বসাতে কোনও সরকারকে কোনওরকম চেষ্টা করতে হয়নি। বাধ্যবাধকতাও নেই। আসল ব্যাপারটা হলো পাকিস্তানে ঢুকে আমেরিকান কমান্ডোরা ওসামা বিন লাদেনকে খতম করেছিল— সেটার হলিউডের (আমেরিকা) এক

চিত্র পরিচালিকা ক্যাথরিন (ডান দিকে নীচে)। চণ্ডীগড়ে স্যুটিং এবং বিক্ষোভ।

দেশভাগের সময়েও ‘লাহোর’-কে ভারতে রাখার জন্য অনেক প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু দাবীদাররা ভারত ভাগের মানচিত্রকার র‍্যাডক্লিফের পাষাণ হৃদয়ে দাঁত ফোটাতে পারেননি। র‍্যাডক্লিফ ও তাঁর দুই সহকারী লাহোরকে ভারতে রাখতে মোটা রকমের ঘুষ চেয়েছিলেন। লাহোরের তৎকালীন আর্য সমাজের নেতারা বলেছিলেন যে, ‘‘বর্তমান লাহোরের (১৯৪৭) মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশই হিন্দু। তাহলে কী করে তা পাকিস্তানে যাবে?’’ এজন্য তাঁরা দিল্লীতেও দরবার করেছিলেন। কিন্তু সেই সংকটকালে এমন একজনও ছিলেন না যিনি র‍্যাডক্লিফের হয়ে ‘খাই’ মেটাতে পারেন। ফলে লাহোর শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতে রয়ে গেছে সিনেমা নির্মাতা রূপোলি পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে চান। এটা এতই রোমাঞ্চকারী এবং লোভনীয় যে, দর্শক এবং নির্দেশক এতে পুলকিত বা উৎফুল্ল না হয়ে থাকতেই পারেন না। লাদেনের মতো এক কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যুর সত্য ঘটনা নিয়ে সিনেমা তৈরি করাটা সিনেমা জগতের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাছে আকর্ষণীয় এবং ততোধিক লোভনীয়ও বটে। বাস্তবে এই ঘটনাটা ঘটেছিল পাক-রাজধানী ইসলামাবাদের খুবই কাছে— এবোটাবাদে। তবুও এবোটাবাদ স্বল্প পরিচিত— অনেকে হয়তো নামই শোনেননি ওই ঘটনা ঘটার আগে। এজন্য সিনেমা নির্মাতারা পুরো ঘটনাটা লাাহোরের পটভূমিতে চিত্রায়িত করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সমস্যা হলো--- লাদেনের আশ্রয়দাতা পাকিস্তান কী করে এই কলঙ্ককাহিনীর সিনেমা বা চিত্রায়ণ সেদেশেই করতে সানন্দে অনুমতি দেয়? এজন্যই হলিউডের সিনেমা-নির্মাতারা সিনেমার বহির্দৃশ্য ভারতেই তুলবেন বলে ঠিক করেছেন। ফলে পাকিস্তানের লাহোরের পরিবেশ, পরিদৃশ্য সবকিছুই পাকিস্তানী ঢং-এ চণ্ডীগড়ে সাজাবার ব্যবস্থা করেন। চণ্ডীগড়কে এক ‘মিনি লাহোর’-এ রূপান্তরিত করে সিনেমার স্যুটিং করতে। এখানে উল্লেখ্য; হলিউডের পরিচালক ক্যাথরিন বিগোলি লাদেন-কে নিয়ে সিনেমা করতে নেমেছেন। ক্যাথরিন প্রায় ছ’মাস চেষ্টা করেও পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে এ নিয়ে পাকিস্তানে দৃশ্য গ্রহণের বা ছবি তোলার অনুমতি আদায় করতে পারেননি। অগত্যা, ভারত এবং চণ্ডীগড়।

চিন্তাধারার স্বাধীনতা :

অবশেষে পাকিস্তানে নিরাশ হয়ে ক্যাথরিনকে ভারতেই আসতে হলো। তিনি ভারতের অনেক স্থান ঘুরে দেখে শেষ পর্যন্ত চণ্ডীগড়েই দৃশ্যগ্রহণ করতে মনস্থ করেন। তাঁর মনে হয়েছে চণ্ডীগড়ে স্যুটিং করলে তা অনেক বেশি সজীব ও দর্শনীয় হবে। পরিচালকের চণ্ডীগড়ে ‘লাহোর’ বানাতে বেশি সময় লাগল না। তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন তাই পেয়ে গেলেন। তাঁর বক্তব্য হলো যদিও বা পাকিস্তানে অনুমতি পাওয়া যেত, সেক্ষেত্রেও কিন্তু ইসলামের নামে অনেক শর্ত মানতে হোত। হয়তো ওখানকার কট্টরপন্থী সমাজ বিদ্রোহ করে বসত। এখন তো পাকিস্তানের কোনও শহরেই খোলামেলা পরিবেশ নেই। শহর, গ্রাম— সর্বত্রই কট্টরপন্থী মৌলবাদীদের রমরমা। যদি তিনি সঠিক, যথার্থ, বিশ্বাসযোগ্য দৃশ্য চিত্রায়িত করতেন সেক্ষেত্রে সরকার সেখানকার সমাজের জন্য তা উচিত মনে করতেন না। তখন পরিচালকের করার কিছু থাকত না। পাকিস্তানের প্রত্যেক শহরেই এখন ধর্মীয় সংকীর্ণতা একপ্রকার সাধারণ ব্যাপার। স্যুটিং-এ কিছু বোরখা পরিহিতা তো রাখতেই হোত। না জানি, পাক-সরকার ও পাক-জনগণ সেটা কীভাবে দেখত! বিরোধিতা হলেই পুরো সেট

বেকার।

চণ্ডীগড়ে শ'-পাঁচেক মহিলা বোরখা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছু রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালাচ্ছে। অনেক হিন্দী নেমপ্লেট বদলে উর্দুতে লেখা হয়েছে। কারও যেন দেখে এমনটা মনে না হয় যে, এটা পাকিস্তান নয়। চণ্ডীগড়কে লাহোর বলে বিশ্বাসযোগ্য করতে দোকানে দোকানে উর্দুতে সাইনবোর্ড। ওখানে পাঞ্জাবী ভাষার সাইনবোর্ড সাধারণ ব্যাপার। হিন্দী, ইংরেজীও দেখা যায়। তবে উর্দুতে দেখা যায় না। সম্ভবই নয়।

কয়েকটি সংস্থার পক্ষ থেকে আপত্তি করা হয়। তাদের বক্তব্য, ছবিতে ভারতকে আল কায়েদা-র লীলাভূমি এবং চণ্ডীগড়ে পাকিস্তানী বাজারের দৃশ্য দেখানো ঠিক নয়। এজন্য তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শনও করেন। জনমানসের এই বিরোধিতা স্বাভাবিক। যখন তাদেরকে বোঝানো হলো যে, ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকা কীভাবে পাকিস্তানে খুঁজে বের করে সাবাড় করেছে— ওটাই সিনেমাতে দেখানো হবে, তখন মানুষ কিছুটা শান্ত হয়। পরিচালক মহোদয়া এতে যারপরনাই আনন্দিত হন। ওসামা বিন লাদেনের জন্ম ইয়েমেনে, বেড়ে ওঠা সৌদি আরবে, কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী হয়ে আফগানিস্তানের পাহাড়-পর্বত-গুহাতে ঘুরে বেড়ানো, আর শেষে পাকিস্তানের আশ্রয়ে থেকে আমেরিকার হাতে মৃত্যু। এখন সেই কাহিনী নিয়ে সিনেমা তৈরি হচ্ছে ভারতবর্ষে। এটাকে ভারতীয় চিন্তাধারার সহিষ্ণুতা এবং খোলামেলা ব্যবহারের চূড়ান্ত উদাহরণ ছাড়া আর কীই বা বলা যেতে পারে।

স্যুটিং চলাকালীন একসময়ে ভারতবাসীরা একাজে বিরোধিতা করার জন্য সেটের আশেপাশে একত্রিত হয়েছিলেন। কেননা বিষয়টা বেশ সংবেদনশীল তো বটেই। ছবির সেটে যখন পাকিস্তানের পতাকা টাঙানো হয় তখন চণ্ডীগড়ের জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা তা ভালোচোখে দেখেননি। তখন তাঁরা পরিচালকের কাছে বিরোধ প্রদর্শন করেন এবং রীতিমতো হুমকি দেন— ভারতের মাটিতে পাকিস্তানী পতাকা তোলা যাবে না। তাঁরা বলতে থাকেন— এখান থেকে দেশের রাজধানী দিল্লী অথবা লালকেল্লা বেশি দূরে নয়। দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক সংসদভবনও

অ্যাবোটাবাদে লাদেনের গোপন ডেরা। ইনসেটে লাদেন।

দিল্লীতে। আজ চণ্ডীগড়ে পাকিস্তানী পতাকা তুলতে দিলে কাল লালকেল্লা এবং সংসদেও তা তোলা হতে পারে। এজন্য পাকিস্তানী পতাকা তোলা নিয়ে কোনওরকম বোঝাপড়া করা যেতে পারে না।

ভারতের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার :

পাক-দৈনিক 'ডন' সম্পাদকীয়ের শেষভাগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উল্লেখ করেছে। 'ডন' লিখেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জাতীয়তাবাদী সংগঠন। তারাই পাক-বিরোধী কাজকর্ম করছে। এখবর প্রকাশ হতেই স্বয়ংসেবকরা রাস্তায় বের হন। তাদের বক্তব্য— আমরা কোথাও পাকিস্তানী পতাকা তোলা বরদাস্ত করব না। এটা রাষ্ট্রের স্বাভিমানের প্রশ্ন। 'ডন' লিখেছে— পরিচালক যেখানে যেখানে পাক-পতাকা লাগিয়েছিলেন তা উপড়ে ফেলা হয়। ফিল্মে স্যুটিং-এ সাঙ্কেতিক পরিবেশ তৈরি একরকম আর চণ্ডীগড়ে পাকিস্তানী পতাকা লাগিয়ে পুরো এলাকা পাকিস্তান করা অন্য বিষয়। ক্যাথরিনকে যতটা সম্ভব বেশিরকম সাহায্য করা হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানী পতাকা লাগানো সহ্য করা হবে না।

এই ঘটনার পর পাক-সংবাদপত্রে লেখা হলো— চণ্ডীগড়ে পাকিস্তানী পতাকা উপড়ে ফেলা হয়েছে। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হয়েছে। একটি উর্দু পত্রিকায় লেখা হোল প্রতিক্রিয়াবশত চণ্ডীগড়ে উর্দুতে লেখা সাইনবোর্ডও উপড়ে ফেলা হয়েছে। ভালো হোত যদি পাকিস্তানী পত্র-পত্রিকা ভারতীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতার একটু হলেও প্রশংসা করত! অকারণে ভারতের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার ওখানের প্রচারমাধ্যম এবং রাজনৈতিক নেতাদের নিত্য-নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কাহিনীচিত্রটি এখনও অসম্পূর্ণ, তবে বিশ্বের জনতা আমেরিকার জাতশত্রু লাদেনকে কীভাবে খতম করেছে তা পর্দায় দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমেরিকা বাস্তবে 'লাদেন খতম অভিযান' টিভির পর্দায় অনেকবার দেখিয়েছে। বিশ্ববাসী লাদেনের জীবনের অন্তিম দৃশ্য বড় পর্দায় দেখার পর অবশ্যই জেহাদি সন্ত্রাস নিয়ে ভাবতে বসবে।

উত্তরবঙ্গ ও ঈশানবঙ্গের অধ্যাত্ম-সাধন ধারায় শিব এবং তাঁর অনুসঙ্গী

ডঃ শিবতপন বসু

Sir Charles Eliot তাঁর Hinduism and Buddism (Vol. II) গ্রন্থে বলেছেন, 'The name Siva is connected with the Tamil word Sivappu.'

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য 'হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে বলেছেন যে শিবপ্পু তামিল শব্দ। এর অর্থ 'রক্তবর্ণ'। শিবপ্পুর শব্দের সঙ্গে শিব শব্দের যোগ আছে। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, উইলিয়াম ক্রুক, অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক হুইটনি, কে. এম. পানিক্কর প্রমুখ পণ্ডিত শিবকে প্রাগার্য মানসের দেবতা বলতে চেয়েছেন। বেদ-সংহিতা প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থে যে শিবের চিত্র পাওয়া যায় তিনি অন-আর্য। ঋগ্বেদে তিনি মনুষ্য-গবাদির সংহারক, অসুর, প্রলয়ী ও 'দুর্গম'। যজুর্বেদে তিনি বিধ্বংসী শক্তি, অথর্ববেদে তিনি ভূত-পতি ও পশুপতি। তৈত্তিরিয় আরণ্যকে তিনি 'তস্করানাংপতি।' 'তিথিতত্ত্বে' তিনি 'ম্লেচ্ছপূজ্য'। ড. সুধীর কুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'আমাদের পরিচয়' গ্রন্থে শিব সম্পর্কে লিখেছেন যে শিবের বাহ্যরূপ বিচার করলে অনার্য ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শিব উলঙ্গ বা তাঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, কণ্ঠে সর্পমালা, বৃষভ তাঁর বাহন, পর্বতে তাঁর বাস, ভূত-প্রেত নিয়ে শ্মশানে তিনি বিচরণ করেন এবং চিতাভস্ম গায়ে মেখে বিষসিদ্ধি বা ধুস্তর সেবন করে থাকেন। সংখ্যাতীত অন্-আর্য নরনারীর নিত্য পূজিত এই শ্মশানচারী 'উন্মত্ত' দেবতা পরবর্তীকালে সূর্য-বিষ্ণু-কৃষ্ণ-ধর্ম প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছেন।

আর্যেতর জাতির শিথিল সমাজ বন্ধনের দ্বারা লৌকিক শিব প্রভাবিত হয়েছেন। কিরাত, চণ্ডাল, কোচ, ডোম, সম্পর্কজাত শিব কালে কালে সাধারণ মানুষের উপাস্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন। আমরা সেই লৌকিক শিব ও তাঁর অনুসঙ্গদের কথা বলব যাঁরা উত্তরবঙ্গ ও ঈশানবঙ্গে আজও পূজা পেয়ে আসছেন।

শৈবস্থান ঈশানবঙ্গ হলো দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকা। ঈশান দেবের নামে এই পুণ্যভূমি যুগ যুগান্ত ধরে আর্য-অনার্যের মিলনভূমি এবং শেষে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান শৈব ভূমিতে পরিণত হয়েছে। বৌদ্ধ বজ্রযান মতে তিনটি ভিন্ন মূর্তিতে শিব প্রতিষ্ঠিত— ঈশান, মহেশ্বর ও মহাকাল, পুরাণে এই তিনটিই শিবের নাম। পুরাণে ঈশান অষ্টদিকপালের অন্যতম--- ঈশান কোণের অধীশ্বর। 'বৌদ্ধতন্ত্রেও ঈশান কোণের অধিপতি ঈশান। তন্ত্রে ঈশান বৃষারূঢ়, ত্রিশূলধারী, ব্যাঘ্র চর্মধারী, পূর্ণচন্দ্র সদৃশবর্ণ। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—

ঈশানং বৃষভারূঢ়ং ত্রিশূলবর ধারিণম্।
ব্যাঘ্র চর্মাম্বর ধরং পূর্ণেন্দু সদৃশ প্রভম্।।

কিন্তু রুদ্রের ঈশান নামটি ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়—

'ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ণবাউ যোষদ্রুদ্রাদসূর্যং।'

এই ঋকে সায়ানাচার্য ঈশান শব্দের অর্থ করেছেন ঈশ্বর। শিব শুধু ঈশান নন, 'ঈষ'ও। তন্ত্রশাস্ত্রে রক্তবর্ণ, চন্দ্রশেখর, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ ঈশ বা শিবের রূপভেদ বর্ণিত হয়েছে। ঈশান কোণের অধিপতি ঈশানদেব শ্বেতবর্ণ, একমুখ, দ্বিভুজ ও বৃষবাহন।' ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' (২য় পর্ব)-এ যে ঈশান প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন সেই ঈশান-ভূমিতেই শৈবমহাতীর্থ ভুবনবাবার অবস্থান। বাঙালির কাছে ঈশানভূমি হলো ঈশানবঙ্গ।

ভুবনবাবা : ঈশানবঙ্গের কাছাড় জেলার মণিপুর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত ভুবন পাহাড়ের ওপর এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শৈবতীর্থ ভুবনবাবার মন্দির। ঈশানবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শিলচর শহর থেকে সোনাই, পালংঘাট, আমড়াঘাট হয়ে মতিনগরের পথ ধরে ভুবন পাহাড়ে উঠতে হয়। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শৈবতীর্থ 'ভুবন'-এর গিরিগুহার উচ্চতা প্রায় ছয় কিলোমিটার। এপথে খাড়াই ভাঙতে হয় বেশি। পক্ষান্তরে, গঙ্গানগর হয়ে যে পথ ভুবনতীর্থের দিকে প্রসারিত তার দূরত্ব আট কিলোমিটারের মতো হলেও আরোহণের কষ্ট কিছুটা কম।

ভুবনতীর্থে রয়েছে ভুবনবাবার মন্দির ও তার অভ্যন্তরে প্রস্তর নির্মিত মূর্তি। মন্দিরের অনতিদূরে রয়েছে জলাধার— পুণ্যার্থীদের প্রয়োজনেই এটি ব্যবহৃত হয়। মন্দিরের মূল বেদিতে দুটি মূর্তি স্থাপিত— একটি ভুবনেশ্বর ও অপরটি ভুবনেশ্বরীর। মূর্তিগুলির নির্মাণকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বলেই মনে হয়। বেদির ওপর দণ্ডায়মান ভুবনেশ্বরের কটিদেশে কৌপিন বস্ত্র, ডান হাত বক্ষে ও বাম হাত উরুদেশে স্থাপিত। দ্বিভুজ শিবের এই

ধরনের মূর্তি খুব বেশি চোখে পড়ে না। এরই সামান্য ব্যবধানে দ্বিভুজা ভুবনেশ্বরী মূর্তি। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্রস্তর-বসনে আবৃতা এই নারীমূর্তির বাম হাত বুকের ওপর স্থাপিত। ডান হাত বর্তমানে ভগ্ন। এরই বেশ কিছু দূরে ভুবন গিরিগুহার অবস্থান। অপ্রশস্ত পথ ধরে কিছুটা এগোলেই সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথ দৃষ্টিগোচর হয়। অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে টর্চ অথবা মোমবাতির প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়িয়ে আদৌ বোঝা সম্ভব নয় যে গিরিগুহার অভ্যন্তরে অসমান দূরত্বে রয়েছে কমপক্ষে তিনটি চত্বর। আরও একটি চত্বরের অস্তিত্বের কথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু সেই চত্বরে শিবলিঙ্গ আছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করতে পারিনি। তৃতীয় চত্বরের ডানদিকে পাথরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে দুটি অস্পষ্ট মূর্তি। সেগুলো বহুদিন ধরেই যে অসংস্কৃত অবস্থায় রয়েছে তা বোঝা যায়। তৃতীয় চত্বরটি অনেক কষ্টে পার হবার পর দেখা যাবে যে হাতের ডান দিকে ও বাঁ-দিকে দুটো অতি সংকীর্ণ পথ চলে গেছে। কোথায় কতদূর গেছে তা জানি না। অনেকের বিশ্বাস, ভুবন-গিরিসুড়ঙ্গ মিলিত হয়েছে কামাখ্যার গিরি-সুড়ঙ্গের সঙ্গে। 'ভুবন'-কে জয় করার জন্যে যুগ-যুগান্ত ধরে শৈব ভক্তেরা যে অসীম সাধনা করে গেছেন সেই সাধন শক্তি আমার নেই। আমি শুধু ভাবি, আজ যে মূর্তির পদতলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এসে মাথা লোটায়, কোনওদিন হয়তো বা সেই মূর্তি তন্ত্রাচারী বৌদ্ধদের দ্বারা পূজিত হতেন। কারণ মূর্তি-পূজক বা সাকার ভক্ত-সম্প্রদায় কেবল হিন্দুধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অন্যান্য সমাজেও প্রচলিত ছিল।

সিদ্ধেশ্বর : ঈশানবঙ্গে সিদ্ধেশ্বর-কপিল মন্দিরে চন্দ্রশেখরের পূজা প্রায় দু' দশক আগে থেকে শুরু হয়েছে। চন্দ্রশেখর অর্বাচীন দেবতা নয়, কিন্তু এখানে তাঁর পূজা সাম্প্রতিককালে শুরু হয়েছে। সিদ্ধেশ্বর-কপিল মন্দিরের পুরোনো থানের সামান্য উপরিভাগে যে চন্দ্রশেখরের মূর্তি নির্মিত হয়েছে তা সিমেন্টের। ইনি ত্রিনয়ন ও বৃষবাহন। এঁর একাধিক হাতে রয়েছে ত্রিশূল, অক্ষমালা, কমণ্ডলু ও বরাভয়। নতুন এই মূর্তিটিকে ডান পাশে রেখে প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেই ডানদিকে পুরোনো শৈব মন্দির কপিলা-সিদ্ধেশ্বর। বর্তমানে সিদ্ধেশ্বর বলতে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর ঘাটের যে স্থানটিকে বুঝি, বিশ শতকের চল্লিশের দশকে সে স্থানে এই শৈব মন্দিরটি ছিল না। বদরপুর শহরের উত্তরে বরাক নদী বর্তমানে যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে বছর পঞ্চাশেক আগে তা আরও উত্তরদিক ঘেঁষে প্রবাহিত হোত। বরাক নদী আজ তার পথ পরিবর্তন করেছে এবং মন্দিরকেও তার পুরোনো স্থান বদলাতে বাধ্য করেছে। সিদ্ধেশ্বর শিবক্ষেত্রটি বহু বছরের জপ-তপ, বলি-হোম ইত্যাদির দ্বারা পবিত্র সিদ্ধপীঠ। সিদ্ধেশ্বর ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করেন। এখানে সাধনায় চতুর্বর্গ লাভ করা যায়। আদিম শৈবানুষ্ঠানে যখন সমগ্র ভারতে বিভিন্ন ধর্ম- সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে ব্যাপ্তি ও প্রসারলাভ করে তখন সিদ্ধেশ্বর এতদঞ্চলে লোকধর্মচর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।

ঈশানদেব : করিমগঞ্জ ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকায় চোরাইবাড়ির কাছে এক স্থানক মন্দিরে ঈশানদেব পূজিত হন। ঈশান শিবেরই এক বিশেষ সংস্করণ। একদা চতুর্হস্ত বিশিষ্ট ঈশানদেবের পূজার ব্যাপক প্রচলন কাছাড় ও ত্রিপুরায় প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। ঊনকোটি শিব প্রতিমার আদলটি যেন এই প্রান্তীয় শৈব মন্দিরে রক্ষিত আছে বলে মনে হয়। ঈশান দেবতার নামে শৈব ভূমি বরাক উপত্যকাকে ঈশানবঙ্গ বলা হয় কিনা ভেবে দেখার বিষয়। 'রুদ্র-যামল' গ্রন্থে শিবের ছয় রূপের উল্লেখ পাই— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরাশিব। 'শৈবাগম' পুঁথি অনুসারে রুদ্র শিবের পঞ্চরূপ— বামদেব, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, অঘোর ও ঈশান। এই পঞ্চরূপের শেষ রূপ-নাম থেকেই বরাক উপত্যকার ব্যঞ্জনাবাহী নাম হয়ত বা ঈশানবঙ্গ। ঈশানরূপী স্থানক শিবের একাধিক প্রতিমা উত্তরপূর্ব ভারতের একাধিক স্থানে পাওয়া গেছে।

কল্কিনারায়ণ : দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার শণবিল এলাকায় কল্কিনারায়ণের 'সেবা' আসলে লৌকিক শিব সেবারই নামান্তর। 'বাবা মহাদেবের চরণে 'সেবা লাগে' বাক্যবন্ধটিতে ব্যবহৃত 'সেবা' শব্দটি ঈশানবঙ্গেও বহুল প্রচলিত। 'রুদ্রযামল' গ্রন্থে উল্লেখিত শিবের ছয়রূপের অন্যতম বিষ্ণু বা নারায়ণের সঙ্গে 'কল্কি' শব্দটি যুক্ত হয়ে 'কল্কিনারায়ণ' হয়েছে। নারায়ণের প্রতীক শালগ্রাম শিলা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিবলিঙ্গের পরিবর্তে শিলাখণ্ডও শিবরূপে পূজিত হন। নারায়ণ ও শিবের এই প্রতীক সাদৃশ্যই কল্কিনারায়ণের জন্ম দিয়েছে। ইনি ঈশানবঙ্গের ধীবর সম্প্রদায়ের পূজিত শিবেরই লৌকিক রূপ। কল্কিনারায়ণ দ্বিভুজ। সুন্দর-সুঠাম এর কলেবর, মাথায় পিঙ্গল জটা, পরিধানে বাঘছাল, ডানহাতে ত্রিশূল, বামহাতে কল্কি। বদনে কোটি চন্দ্রের আভা বিচ্ছুরিত। তিল ফুলের মতো এঁর নাসা। একদিকে ক্ষত্রিয়ের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের অহমিকার চাপে পড়ে বৈশ্য, শূদ্ররা যখন চরম অবহেলা আর উপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল তখনই শিব-অনুসঙ্গী লৌকিক দেবতা কল্কিনারায়ণের উদ্ভব হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস।

কল্কিনারায়ণের সেবায় সোয়া পরিমাণ দ্রব্য দিতে হয়। ফুল, পান, ধূপ ও দীপ দিয়ে 'আসন সাজাতে হয়। সাতটি টিকা জ্বালিয়ে সাত ছিলিম তামাকে হুঁকো-কল্কি সাজাতে হয়। সাত জন ব্রতচারী সারিবদ্ধ হয়ে বসে এক থেকে সাত দম তামাক টানেন। একজন ব্রতচারী— যিনি কল্কিনারায়ণের উদ্দেশে জয়ধ্বনি দেবেন তিনি তিন সপ্তাহের মধ্যে কল্কি-নারায়ণের পূজার আয়োজন করবেন। কল্কি নারায়ণের সংগৃহীত পাঁচালীতে পাই—

আমারে পূজিতে কোনও বর্ণভেদ নাই।
ধনী দীন নির্বিশেষে সব ঘরে যাই।।

জটপটবাবা : বলা বাহুল্য, ইনি কোনও শাস্ত্রীয় দেবতা নন, একান্ত ভাবেই ঈশানবঙ্গের লৌকিক দেবতা। ইনিও শিবের অনুসঙ্গী। 'জট' শব্দটি শিবের জটাজুটের স্মৃতিবাহী। লোকমানসে এই দেবতার জন্ম। তাই সব সময় দেব-নামবাহী শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ নাও মিলতে পারে। লোক বিশ্বাস মতে ত্রিনাথের ছোট ভাই জটপট। ধন-জন-শ্রী বৃদ্ধিতে সমস্যা অনেক। এই সমস্যার সমাধান যখন একটি মাত্র দেবতার পক্ষে সম্ভব হয় না বলে মানুষ মনে করেন তখন তাঁরা একই সঙ্গে একাধিক দেবদেবীর শরণ নেন। এই ভাবেই ঈশানবঙ্গে ত্রিনাথ বা সিদ্ধেশ্বরের পাশে জন্ম নিয়েছেন জটপট ঠাকুর। এঁর মৃন্ময় মূর্তির সঙ্গে দ্বিভুজ শিবমূর্তির নানা দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে।

বাবাহর : ঈশানভূমির গ্রামে-গঞ্জে এখনও বাবাহর ঠাকুরের সেবা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। 'বাবামহাদেব' ও 'হর হর মহাদেব' শব্দ বন্ধ থেকেই 'বাবাহর' শব্দের সৃষ্টি বলে আমার প্রত্যয়। ইনিও শিবের অনুসঙ্গী। কৃষির সঙ্গে শিবদেবতা যেভাবে যুক্ত হয়েছেন, ইনিও তেমনি ভাবে কৃষিকাজ ও গো-সেবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন। বাবাহরের সেবা দিলে—

'হারাইল ধন ঘর লয় কাটা মাথা জোড়া লয়।'

এক সময় বাবাহর ছিলেন 'সত্যনারায়ণ (কৃষ্ণ)-এর ভাই বলরাম। পরে হলো বলরামের

সঙ্গে কৃষি-কেন্দ্রিক দেবতা শিব যুক্ত হয়ে লোকদেবতা 'বাবাহর'-এ রূপান্তরিত হয়েছেন।

তিননাথ : বাংলার নানাস্থানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর 'ত্রিনাথ' নামে লোক-সমাজে পূজিত হন। কিন্তু ঈশানবঙ্গে তিননাথ সেবায় 'বাবা মহেশ্বরে'রই' প্রাধান্য।—

ভাং খেয়ে বিভোর ভোলা ভূতগণ সঙ্গে নাচে।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান ওই খসিয়া পড়িছে।।

তিননাথ পূজান্তে 'বিশেষ প্রসাদ' রূপে গাঁজা পরিবেশিত হয়।

আই : 'ঈশান' শব্দের অর্থ ঈশ্বর। এই ঈশ্বর থেকেই যোগীগণ এবং একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি বলে নাথ পন্থীদের বিশ্বাস। যোগীদের মধ্যে প্রথম হলেন মহাযোগী। এঁর পুত্রের নাম বিন্দুনাথ। বিন্দুনাথের পুত্র আইনাথ। আইনাথের পুত্র মীননাথ। মীননাথের পুত্র গোরক্ষনাথ। ঈশানবঙ্গে শুধু মীননাথ বা গোরক্ষনাথই যোগী সমাজ কর্তৃক বন্দিত হন না। 'আই' সেবাও ঈশানবঙ্গে শৈব-সাধন ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরবর্তীকালে আই সেবার সঙ্গে বৈষ্ণব অধ্যাত্ম সাধন ধারা যুক্ত হয়ে আইদেবতা শৈব-বৈষ্ণব ভাবধারা সমন্বিত এক মিশ্রদেবতায় পরিণত হয়েছেন। আই কৃষিকেন্দ্রিক দেবতা এবং ইনি শিবের অনুসঙ্গী।

জল্পেশ শিব : যোগিনীতন্ত্রের একাদশ পটলের ১৭ ও ১৮ শ্লোকে প্রাচীন কামরূপেরই বায়ুকোণে জল্পেশ মহাতীর্থের অবস্থান। গড়তলী-জল্পিশ গ্রামে জল্প শিবের মন্দির— একান্ন মহাপীঠের মধ্যে যার নাম অক্ষয় হয়ে আছে। গ্রামের পশ্চিমে বয়ে চলেছে জটোদা বা জটোদ্ভবা নদী জয়শিব! মহাভারতের উত্তরে গঙ্গোত্রী, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্বে-পশ্চিমে কপিলেশ্বর-কামাখ্যা। সর্বত্রই তাঁর অবস্থান। কোথাও তিনি ধূমাবাবা, কোথাও লোকনাথ, কোথাও রাম চাং, কোথাও বা গমীরা।

জল্পেশ শিবের মন্দির-অভ্যন্তরে আছে গৌরীপাট— যার প্রায় দু' ফুট নিচে শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট অনাদি লিঙ্গের অবস্থান। শৈব সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান জল্পেশ মন্দিরের মার্জিত শিলাস্তম্ভ বা শিবলিঙ্গ আজও ভক্তদের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কম করে বার সাতেক ভূমিকম্পের ফলে এ মন্দিরের পুরোনো কাঠামো ও তার অভ্যন্তরস্থ প্রস্তর নির্মিত অনাদি লিঙ্গ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনশ্রুতি এই যে হিতারী নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সর্বপ্রথম অনাদি লিঙ্গের আচ্ছাদন স্বরূপ নির্মাণ করেছিলেন জল্পেশ মন্দির। অন্য আর একমতে ৮০০ খৃস্টাব্দে বর্মণ বংশের শেষ রাজা জল্পেশের অনাদি লিঙ্গ স্থাপন ও মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত করেছিলেন। জল্পেশ শিবের মূল মন্দির যেখানে তারই হাত কয়েক দূরে ঈশান কোণে মহাদেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। কবে সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি নির্মিত হয় তা জানা যায়নি।

মহাকাল : উত্তরবঙ্গে জটেশ্বর, বাণেশ্বর, মহাকাল রুদ্রশিবের মূর্ত্যন্তর। মহাকাল শিবের ভিন্ন মূর্তিরূপে পরিকল্পিত। মহাকাল ভৈরব নামে পৃথক কায়া গ্রহণ করেছে। ঈশানবঙ্গে একাধিক 'ভৈরববাড়ি' আছে যেখানে শিব ভৈরব নামে পূজিত হন। আসলে মহাকাল হলেন সূর্য। কারণ তিনিই কালের স্রষ্টা। কিন্তু পরবর্তীকালে মহাকাল শিবের সঙ্গে অভিন্ন হয়েছে। কারণ 'কালরূপী মহাদেব বারোমাসের বারো রাশিতে অবস্থিত দ্বাদশ আদিত্য।' উত্তরবঙ্গে ইনি পর্বত ও বনাঞ্চলের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারক। হিংস্র জন্তুর কবল থেকে ইনি ভক্তদের রক্ষা করেন।

ঋষি : উত্তরবঙ্গে স্বচ্ছল রাভাদের গৃহে একটি পূজাবেদী বা উপাসনা গৃহ থাকে। রুনতুক বা থানসিরি হলো রাভাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা 'ঋষি'র আবাসস্থল। থানসিরি বা থানছিরি শব্দটি থানশ্রী শব্দের অপভ্রংশ বলে মনে হয়। কারণ রাভা ও রাজবংশী সমাজের কথ্য ভাষায় 'শ্রী' উচ্চারিত হয় সিরি বা ছিরি। ঋষি হলেন শিবেরই অনুসঙ্গী দেবতা শিব চতুর্দশীর দিনে ঋষির পূজা হয়। মন্ত্রপাঠ বা বলিদানের প্রথা ঋষি পূজায় নেই।

মাশান : শ্মশান-মশানে বিচরণকারী ভূত-পিশাচ পরিবৃত দেবতা মাশান। ইনি শিবের অনুসঙ্গী লোকদেবতা। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজে এই দেবতার পূজা একদা বহুল প্রচলিত ছিল। গবেষক গিরিজাশংকর রায়ের অভিমত এই যে পূর্বে হয়তো মাশানের পূজা শ্মশানে দেওয়া হোত। কিন্তু ক্রমে এই পূজার ব্যাপকতা ঘটলে শ্মশান থেকে অন্যত্র থান তৈরি করে পুজোর ব্যবস্থা হয়েছে। একদা বাড়িকা, তিশিলা, ঘাটিয়া, বিপুয়া, অঙ্গিয়া প্রভৃতি আঠারো রকমের মাশান পূজার প্রচলন ছিল উত্তরবঙ্গে। এইসব অপদেবতা কালে কালে দেব-পর্যায়ে উন্নীত হয়ে শিব-অনুসঙ্গী হয়েছেন।

বুড়া মদনকাম : এই দেবতাকে শিব ও তাঁর অনুসঙ্গীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। 'বুড়া' বলতে আদি দেবতা শিবকেই বোঝানো হয়। মদনকামের প্রতীক রঙিন কাপড়ে সুসজ্জিত বাঁশ— যা রাজবংশী সমাজে শিবলিঙ্গের মতোই মান্যতা লাভ করেছে। মাত্র একদিনের এই মদনকাম পূজায় 'মাউন' ও উৎসব শেষে বাঁশগুলিকে নিকটবর্তী জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়।

মহারাজ : রাজ পোষাক পরিহিত, হস্তীপৃষ্ঠে আসীন গ্রামদেবতা মহারাজ উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে শিবজ্ঞানে পূজিত হন। সাধারণত আষাঢ় মাসে মহারাজ পূজার আয়োজন করেন রাজবংশী সমাজের মানুষ। পল্লব-পুষ্প-ফলমূলাদির সঙ্গে কলকি, গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদি মহারাজার উদ্দেশে নিবেদিত হয়। কোথাও কোথাও পায়রা ও পাঁঠাবলি দেওয়া হয়।

সন্ন্যাসী : পদ্মাসনে উপবিষ্ট, শুভ্রদেহধারী, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, রুদ্রাক্ষমালা ও সর্পশোভিত সন্ন্যাসী বাবার পূজা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে চৈত্র সংক্রান্তি ছাড়াও বছরের যে কোনও দিন পূজিত হন। দই-চিঁড়ে, বিচিকলা, ধুতুরা ফুল ও গাঁজা এই দেবতার উপচার। ইনি বিপদ তারণ দেবতা। ইনি শিবের লৌকিক বা অশাস্ত্রীয় সংস্করণ।

ধূমবাবা : জলপাইগুড়ি জেলার কোথাও কোথাও ধূমবাবার পূজা হয়। শিবলিঙ্গ সদৃশ এই প্রতীক দেবতার উদ্দেশে চালকলা ছাড়াও গাঁজা নিবেদিত হয়। ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশীতে ধূমবাবার পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বাস্তুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গ : শিবলিঙ্গের এই দুই রূপের পরিচয় পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গ ও ঈশানবঙ্গে। তবে পৌরাণিক শৈব ধর্মই এই দুই অঞ্চলে কালে কালে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। একাধিক রাজবংশীয় পুরুষের পোষকতার ফলেই প্রজাসাধারণের মধ্যে শিবপূজা নানা নামে এবং পদ্ধতিতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

উপসংহারে ঈশানভূমি বা ঈশানবঙ্গের শিব বিষয়ে আর ও দু-একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি। ঈশানবঙ্গে আদিম কাছাড়ীদের প্রধান দেবতা শিব। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিবের নানা নাম— গিলা, দামব্রা, খারিস, শ্রীবারায় (শিববায়), বাথৌ ইত্যাদি। ইনি শস্য রক্ষাকর্তা এবং পাপী-তাপীর ত্রাণকর্তা। এই শিব বা দেবাদিদেব মহাদেব 'পরম পিতা'। তাঁকে পূজা করলে মর্তলোকের জীব ত্রাণ পায়। ঈশানবঙ্গে কাছাড়ীদের মধ্যে আজও এই বিশ্বাস অটুট আছে।

গাজন-নীল-চড়ক

সংকর্ষণ মাইতি

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন— 'যত্র জীব তত্র শিব'। আরও বলেছেন— 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'। সমগ্র প্রাণীর মধ্যে শিবের অবস্থান বলে শিবজ্ঞানে জীবের সেবার কথা বলেছেন। এই শিব হলেন ত্রিদেবের এক দেব। ত্রিদেব হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। (ত্রিদিব অর্থে স্বর্গ) শিব হলেন সকলদেবের প্রধান— দেবাদিদেব। শিবের আরও অনেক নাম রয়েছে। মহাদেব, ঈশান, কৃত্তিবাস, গিরিশ, চন্দ্রশেখর, ভব, ত্রিলোচন, ত্রম্বক, ধূর্জটি, পশুপতি, বিরূপাক্ষ, ব্যোমকেশ, মহেশ, ভোলানাথ, মহেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, রুদ্র, শংকর, শম্ভু, শর্ব, সর্ব, হর প্রভৃতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু-মহেশ্বর হলেন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রতীক। মহেশ্বর বা শিব হলেন জগৎ সংহর্তা অর্থাৎ জগৎ সংহারকারী দেবতা। সংহারক। কথা হলো, শিব কি শুধু সংহার বা প্রলয়ের প্রতীক? না। শিবের অর্থ— শুভ, মঙ্গল। ইনি মঙ্গলময়। গায়ের রঙ সাদা। সত্য-সুন্দর-স্বচ্ছতা- চেতনার প্রতিমূর্তি দেবাদিদেব মহাদেব। মঙ্গল কামনা এবং আশীর্বাদ কামনায় নরনারী মহাদেবকে আলিঙ্গন করেন। অধিকাংশ জায়গায় শিব লিঙ্গরূপে পূজিত হন। কাজেই আশীর্বাদ বা মঙ্গলকামনায় নরনারী শিবলিঙ্গকে আলিঙ্গন করে মনের কথা ব্যক্ত করেন। একে 'কোল' দেওয়া বলে।

বছরে তিনবার শিবঠাকুরকে নিয়ে অনুষ্ঠানপর্ব। শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জলঢালা অনুষ্ঠান। শ্রাবণী মেলা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন জায়গায়। ফাল্গুনে শিব চতুর্দশী। আঠারো শতকে মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ কবি রামেশ্বর চক্রবর্তী শিবায়ন কাব্যে শিবচতুর্দশী নিয়ে লিখেছেন—

"ফাল্গুনে যে চতুর্দশী কৃষ্ণপক্ষে হয়,
তাহার যে রাত্রি তাকে শিবরাত্রি কয়।
সেই শিবরাত্রির ব্রত যেইজন করে,
নিশ্চয় ভবের হয় ভবভয় তরে।"

শিব চতুর্দশী বা শিবরাত্রিতে মহিলারা ব্রত করে থাকেন। অবিবাহিত মহিলারা বিয়ের জন্য ব্রত করেন। বিবাহিত মহিলারা স্বামী ও সংসারের মঙ্গল কামনায় শিবের ব্রত করেন।

চৈত্র মাসে নীল পুজো, গাজন ও চড়ক। সংক্রান্তিতে চড়ক, চড়কের আগে গাজন শিবকে কেন্দ্র করে। নীলপুজোও তাই। সন্তানাদির মঙ্গল কামনায় মায়েরা উপবাস করেন। দুধ-ডাব-চিনি শিবলিঙ্গে অর্পণ করেন। শিবলিঙ্গকে আলিঙ্গন করেন। অসুখ-বিসুখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুরুষ, মহিলারা আলিঙ্গন করেন।

চৈত্রে শিবের গাজন, চড়ক বোধহয় সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক।

'চৈত্র মাসে চড়ক পুজো গাজনে বাঁধ ভারা,
বৈশাখ মাসে দেয় সকল তুলসী গাছে ঝারা।'

চৈত্র মাসে গাজন। গাজনের অর্থ উৎসব। কেউ কেউ গাজন-উৎসব বলেন। বৈশাখ মাসেও গাজন অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসের গাজনকে চৈত্র গাজন বা চৈতা গাজন বলে। বৈশাখ মাসের গাজনকে বৈশাখী গাজন বলে।

নীলপুজো ও সংক্রান্তির চড়ক নিমিত্ত গাজন সন্ন্যাসীদের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। নীল পুজো, চড়ক নিমিত্ত গাজন-সন্ন্যাসীরা গ্রামে গঞ্জে তীর্থ ও চাল সংগ্রহে বের হন। (বর্তমানে শহরে, আধা শহরে সঙ সেজে বের হন অনেকেই।) সঙ্গে বাজনদার, গাজন-সন্ন্যাসীদের হাতে থাকে বেতের গাছি, ত্রিশূল এবং গাজন-বাঁশ। গাজন-বাঁশে একুশটি পাব অর্থাৎ একুশটি পর্ব থাকে। ডগায় লাল নিশান, একটি গামছা বাঁশে বাঁধা থাকবে, তার নীচে শিবের নামে উত্তরীয়। গাজন-সন্ন্যাসীরা সঙ সেজে বেরোন। হর-পার্বতী, নন্দিভৃঙ্গি সেজে বেরোন। মানুষকে হাল্কা আনন্দ পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে সঙ সাজা। সাধারণত শিবদুর্গার কাহিনি নিয়ে গান, তরজা, নৃত্য পরিবেশিত হয়।

গাজন ও নীল উৎসব

গাজনের নিয়মকানুন বেশ কঠিন, কষ্টকর। নীল উৎসবের ন'দিন আগে থেকে গাজন-সন্ন্যাসীরা ভিক্ষায় বেরোন। তার আগে একটি পুকুরে ঘটোদক হয়। যে পুকুরে ঘটোদক হয়, সে পুকুরকে রাত বারোটার পর জাগাতে হয়, ধুনি জ্বালাতে হয়, বাবার নামে সেবা ডাকতে হয়। রাত্রি প্রভাত হলে ব্রাহ্মণ দিয়ে ঘটোদক। ঘটোদকের আগের দিন মূল পাট-ভক্ত (অঞ্চলভেদে এঁকে পাট-ভক্তা বা পাট-ভগদা বলা হয়।) হবিষান্ন করে থাকেন। ...ঘটোদকের দিন থেকে মন্দিরে সূর্যার্ঘ দেওয়া হয়, প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে। সেবা ডাকতে হয়; সেবার পর ভোগ নিবেদন। ভোগের উপকরণ— আতপচাল, ঘি, মধু, কলা মিষ্টি ইত্যাদি। কোথাও কোথাও ভোগটি জলে ভাসানো হয়। ভাসানের পর গাজন-সন্ন্যাসীরা জলযোগ করেন। ফল-মূল-দুধ ইত্যাদি।

গাজন-সন্ন্যাসীরা রান্না করেও খান। রাত তিনটের মধ্যে পাট চোকাতে হয় রান্না-বান্নার। প্রতিদিন নতুন মালসায় রান্না। নির্জনে রান্না। ডাকাডাকি একেবারে বন্ধ। ঘটোদকের পরের দিন থেকে গাজন-সন্ন্যাসীরা গাঁয়ে গঞ্জে চাল ও অর্থ সংগ্রহে বেরোন সঙ সেজে বাদ্যি সহকারে।

ঢাকের বাদ্য বা বাজনা দূর থেকে কানে ঠেকলে বোঝা যায় এটি গাজনের বাজনা। উৎসব অনুযায়ী বাজনদার ঢাক বাজান। শারদোৎসবের কিংবা রথোৎসবের বাজনা যেমন আলাদা, আলাদা, তেমন গাজন ও চড়কের বাজনাও আলাদা আলাদা। গৃহস্থের উঠোনে পা দিয়েই গাজন-সন্ন্যাসী হাঁক পাড়েন— 'বাবা ভোলানাথের সেবা

লাগে।' এরপর ঢাকের বাদ্য-বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে হর-পার্বতী নন্দি-ভৃঙ্গি-নাচানাচি শুরু করে দেন। বাড়ির লোকজন সাধ্যমতো চাল বা টাকা দিয়ে থাকেন। সারাদিন গাঁয়েগঞ্জে কাটিয়ে মন্দিরে ফেরা। ক্লান্ত শরীরে। সূর্যাস্তের আগে সূর্যপ্রণাম।

''ওঁ জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্

ধ্বন্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণোতোহস্মি দিবাকরম্।''

এবার শিবমন্দিরের দ্বার খোলার সময়। তা কপাট তো বন্ধ। এঁদের পরিচয় জানতে চান মন্দিরের সেবায়েত বা পুরোহিত। গাজন সন্ন্যাসীরা মন্দিরের দ্বারের কপাট খোলার কথা বলেন। পুরোহিত জিজ্ঞেস করেন—

'কোথা হতে এলে তোমরা কোন্ দেশেতে ঘর,
কাহার সেবক হও তোমরা বলহ সত্বর।
কে তোমাদের পাত্র মন্ত্রী ধামাই অধিকারী?
কাহার গৌরবে তোমরা কর চাতুরারি?
কাহার গৌরবে তোমরা মারো মালসাট?
পরিচয় দিলে তবে দেউলের ঘুচিবে কপাট।'

গাজন-সন্ন্যাসীর তরফে পাটভক্ত উত্তর দেন—

'শিবভক্ত হই আমরা শিবনগরে ঘর,
আমাদের রাজা হলেন বাবা মহেশ্বর।
নন্দি-ভৃঙ্গি পাত্রমন্ত্রী ভোলানাথ হয় রাজা,
তাঁদের গৌরবে আমরা উড়ায়েছি ধ্বজা।
তাঁহার গৌরবে আমরা মারি মাল সাট,
পরিচয় দিলাম, ঘুচাও দেউলের কপাট।'

কপাট খুলতে নারাজ পুরোহিত। আরও প্রশ্নের উত্তর চাই।

প্রশ্ন—

'ধুল সাপট খেলবে ভাই ধুলের কহ নাম
কোন ধুলে তুষ্ট তোমার অমিয় সাগর?
কোন ধুলে তুষ্ট তোমার ভোলা মহেশ্বর?
ইহার বৃত্তান্ত-কথা বলিবে সবারে,
তবে তো খেলিবে ধুল গাজন ভেতরে।'

উত্তরে পাট-ভক্ত বলেন—

'ধুল-সাপটি খেলি আমরা ধুলের কহি নাম,
ইন্দ্রধুলে (আবির) তুষ্ট আমার কৃষ্ণ বলরাম।
সমুদ্রের ধুলে তুষ্ট অমিয় সাগর,
ধূপধুনায় তুষ্ট মোদের ভোলা মহেশ্বর।'

আবার প্রশ্ন—

'ফুল-সাপট খেল তোমরা ফুলের কহ নাম
কোন ফুলে তুষ্ট তোমার কৃষ্ণ বলরাম?
কোন ফুলে তুষ্ট তোমার অমিয় সাগর?
কোন ফুলে তুষ্ট তোমার ভোলা মহেশ্বর?'

পাট-ভক্তর উত্তর—

'ফুল-সাপট খেলি আমরা ফুলের কহি নাম
চাঁপা ফুলে তুষ্ট আমার কৃষ্ণ বলরাম।
বেল ফুলে তুষ্ট আমার অমিয় সাগর,
ধুতরা ফুলে তুষ্ট আমার ভোলা মহেশ্বর।'

প্রশ্ন—

'জল-সাপট খেল তোমরা জলের কহ নাম
কোন জলে তুষ্ট তোমার কৃষ্ণ-বলরাম?
কোন জলে তুষ্ট তোমার অমিয় সাগর?
কোন জলে তুষ্ট তোমার ভোলা মহেশ্বর?

পাট-ভক্তর উত্তর—

'জল-সাপট খেলি আমরা জলের কহি নাম,
গঙ্গাজলে তুষ্ট আমার কৃষ্ণ বলরাম।
সমুদ্রের জলে তুষ্ট আমার অমিয় সাগর,
ইন্দ্রজলে (ডাবে) তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর।'

এবার গঙ্গাজল নিয়ে প্রশ্ন—

'ব্রহ্মা কমণ্ডুলে ছিল গঙ্গা, জানে সর্বনরে,
সে গঙ্গা অহিল মর্তে কেমন প্রকারে?
সে গঙ্গা আনিল কেবা সত্য করে বল?
তবে তো জানিব আমরা নিশ্চয়ই গঙ্গাজল।'

পাট-ভক্তর উত্তর—

'একদিন হরহরি বসে একাসনে,
নারদ বাজায় বীণা সুমধুর তানে।
নারদের গান শুনি শরীর উথলিল,
বিষ্ণু পাদপদ্ম হতে গঙ্গা উপজিল।
সে গঙ্গা রহিল গিয়া ব্রহ্মার কমণ্ডুলে,
তা থেকে গঙ্গা বাহির হইলে।
গঙ্গা আটকা পড়ে শিবের জটাজালে,
ভগীরথ আনিল গঙ্গা অনেক তপের ফলে।
ভগীরথ আনিল গঙ্গা বংশ উদ্ধার কারণ,
সেই জলে করি আমরা দুয়ার মার্জন।'

পাট-ভক্ত বা পাট-সন্ন্যাসীর উত্তরে পুরোহিত খুব খুশি। এবার দ্বারের কপাট খোলার পালা। কপাটের পরিচয় আছে। পূর্ব দ্বারের কপাটের নাম সোনার কপাট, পশ্চিম দ্বারের কপাটের নাম তাম্বার কপাট, উত্তর দ্বারের কপাটের নাম লোহার কপাট, দক্ষিণ দ্বারের কপাটের নাম রুপোর কপাট এবং ঊর্ধ্ব দ্বারের কপাটের নাম পুষ্প কপটি।

দ্বারের দ্বারীদের (দ্বার রক্ষক) নামও রয়েছে। পূর্বদ্বারে ভানুভাস্কর, পশ্চিম দ্বারে নন্দী মহাকাল, উত্তরদ্বারে হিমালয়, দক্ষিণ দ্বারে বীর হনুমান এবং ঊর্ধ্ব দ্বারে ধর্ম নিরঞ্জন।

যাইহোক, গাজন-সন্ন্যাসীদের জন্য দ্বার খোলা হলো। গাজন-সন্ন্যাসীরা সংখ্যায় কম না। গাজনের সময় সংখ্যাটা নাকি ৭২ জনের মতো হয়। তবে প্রতিদিন এই সংখ্যা প্রত্যেক জায়গায় হয় না। বর্তমানে সন্ন্যাসীর সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

কপাট খোলার আগে সন্ন্যাসীরা দণ্ড কাটেন, সষ্টাঙ্গ প্রণাম সারেন। দ্বারের কপাট খোলা হলে শিব ঠাকুরের সেবা ডাকা হয়। ধুনুচি নাচ, দণ্ড নাচ হয়। দণ্ড নাচের সময় পুরোহিতের প্রশ্ন থাকে।

'দু' হাতে ধরেছ দণ্ড ব্রহ্ম হুতাশন
বুক মুখ পুড়ো তোমরা কিসের কারণ?
বুক মুখ পুড়ো কেন দেশে দেশে ফেরো
এরূপ নিষ্ঠুর কর্ম কেন তোমরা কর?
ইহার বৃত্তান্ত-কথা বলিবে আসরে,
তবে তো নাচিবে দণ্ড এই গাজন ভেতরে।'

পাট-সন্ন্যাসী উত্তর দেন—

'দু' হাতে ধরেছি দণ্ড ব্রহ্ম হুতাশন,
বুক মুখ পুড়ে না মোদের শিব সেবার কারণ।
বুক মুখ পুড়ে না মোদের দেশে দেশে ফিরি
এই রূপে আমরা সবে শিব সেবা করি।'

ন' দিন নিয়মকানুন সারা হয় এইভাবে। নীল উৎসবের আগের দিন বিকেল বেলায় বঁটি-ঝাঁপ অনুষ্ঠিত হয় সেখানে, সেই জায়গায় মাথা সমান উঁচু করে একটি ভারা বাঁধা হয়। পাট-সন্ন্যাসীর দুটি হাত জোড় করে শিবের দিকে মুখ থাকে। একজন সন্ন্যাসী তাঁকে দোলায়। মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়।

'দেবং দেবং মহাদেবং
মহাযোগী মহেশ্বরম্
সর্ব পাপং হরং দেব
মকরায় নমঃ নমঃ।'

দোল খাওয়া সন্ন্যাসী ও মন্ত্র বলেন। দণ্ডকাটা, ধুনুচি নাচ, দণ্ড নাচ ও ভারায় ঊর্ধ্ব-পদ হয়ে দোল খাওয়ার তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। শারীরিক ব্যায়াম হয়ে থাকে এইসব প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানে।

বঁটি-ঝাঁপ একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। কয়েকজন মানুষ একটি মোটা কাপড়ের চারকোণ ধরে থাকেন। মাঝে একটি বঁটি রাখা হয়। পাট-ভক্ত বা পাট-সন্ন্যাসী ভারা থেকে লাফ দিয়ে ওই বঁটির ওপর ঝাঁপ দেন। একে বঁটি-ঝাঁপ অনুষ্ঠান বলে। বঁটি-ঝাঁপ নিয়ে একটি জনশ্রুতি-নির্ভর কাহিনির উল্লেখ করা হচ্ছে।

তখন ইংরেজ আমল। এক সাহেব বাঙালির বঁটি-ঝাঁপটি দেখে শিবঠাকুরের মাহাত্ম্য পরীক্ষা করতে আগ্রহী হলেন। বিশাল মাপের বঁটি আনালেন। নীলের আগের দিন বঁটি-ঝাঁপ। পাটভক্তের বুক থরথর। বঁটি-ঝাঁপের আগের

দিন রাতে ঘুমোবার সময় শিব ঠাকুরের স্মরণ নিলেন। স্বপ্নে শিবঠাকুর যেন বলছেন, 'আরে ভয়টা কিসের? আমি তো আছি। ভারায় উঠে আকাশে তাকাবি। আমি চিল হয়ে উড়ব। ওই চিলকে প্রণাম করে ঝাঁপ দিবি, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না।...'

পাট-ভক্ত ঝাঁপ দেওয়ার আগে আকাশে তাকালেন, সত্যিই একটি চিল আকাশে উড়ছে। স্বপ্ন সত্যি হবেই। চিলের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে 'জয়বাবা ভোলানাথ' বলে বঁটির ওপর ঝাঁপ দিলেন। বঁটি কাত হয়ে পাশে শুয়ে গেল। তা দেখে সাহেব তো অবাক। সেই থেকে বাঙালির শিবঠাকুরের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাসটা বেড়ে যায় তাঁর।...

গাজন-সন্ন্যাসীদের কষ্ট-কসরত দর্শকদের বেশ আকর্ষণ করে। যেমন খেজুর গাছ মোড়ানো, বা কাঁটার ওপর গড়াগড়ি যাওয়া। বঁটি-ঝাঁপের দিন গাছ মোড়ানো। খেজুর গাছের ঝাঁপটা উপেক্ষা করে লম্বা পাতা মুড়িয়ে মুড়িয়ে গাজন-সন্ন্যাসী গাছের মাথায় গিয়ে বসেন। আবার মাটিতে খেজুর কাঁটাসহ তিনধরনের কাঁটা বিছিয়ে দেওয়া হয়। গাজন-সন্ন্যাসী কাঁটার ওপর বেশ কয়েকবার গড়াগড়ি খান। কাঁটা বিঁধে না।...

নীল উৎসবের দিন গাজন-সন্ন্যাসীরা প্রায়শই কিছু খান না। সন্ধ্যায় ধুনো জ্বেলে ডাব ফলমূল খেয়ে থাকেন। পরের দিন চড়ক। তারও প্রস্তুতি চলে। গাজন-সন্ন্যাসীদের ভূমিকা থাকে।

চড়কের ভোরে অর্থাৎ নীল রাত্রির শেষে শিব-কালীর আকর্ষণীয় নৃত্য পরিবেশিত হয় বিভিন্ন জায়গায়। পূর্ব-মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের অধীন সুন্দরা গ্রাম। (বিপ্লবী সুশীল কুমার ধাড়া মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ বাহিনীর সূচনা সুন্দরা গ্রামে হয়েছিল।) সুন্দরা গ্রামে রয়েছেন সুন্দরেশ্বর শিব। নীল উৎসবের শেষ রাতে এখানে শিব ও কালীর নৃত্য দেখতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন। ...নীলের দিনে শিব ঠাকুরকে কোল দিতে দেখা যায়।

চড়ক

চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক। বিকেল বেলায় গাজন-সন্ন্যাসীরা চড়ক গাছে চড়েন। পিঠে, কোমরে কাপড় বেঁধে এঁদের ঘোরানো হয়। ঘোরার সময় ফলমূল দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দেন। চড়কের মেলায় আবার সঙও বের হতে দেখা যায়। হর-পার্বতী সেজে বাজনদারদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মেলায় পয়সা বা ফলমূল তোলেন। এঁদের চড়কের সঙ বা চড়ুকে সঙ বলে। কোথাও কোথাও আবার চড়কের সঙ-এর জন্য ছড়া বা গান রচনা করে গাওয়া হয়। যেমন— ''চড়ক ঘোরে বন্‌বন্ আয় লো কাছে সই, দু' জনাতে ঘুরতে ঘুরতে মনের কথা কই।''

এখনও অনেক জায়গায় 'পিঠ-ফোঁড়া' চড়কের কথা শোনা যায়। গাজন-সন্ন্যাসীর পিঠের চামড়ায় লোহার শিক বা হুক গেঁথে দেওয়া হয়। পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরে তবু গাজন-সন্ন্যাসী যন্ত্রণা সহ্য করে বনবন ঘোরেন। এরকম রীতি বা নিয়ম একেবারে বন্ধ হওয়া দরকার। এটা নির্মমতার দৃশ্য। বন্ধ হওয়া দরকার।

বছরের শেষে সংক্রান্তির এই চড়ক উৎসবের তাৎপর্য রয়েছে বৈকি। চড়কের ওপরের বাঁশকে বর্তুলাকারে ঘোরানো হয়। ঋতুচক্রের এটি প্রতীক। বসন্তের শেষে নতুন বছর শুরু গ্রীষ্ম ঋতু দিয়ে। ঘটোদকের ঘটের চারপাশে অঙ্কুরিত ধান রেখে দেওয়া হয়। তা থেকে খুব ছোট ছোট চারাগাছ বেরোয়। যে দিকে চারা ভালো জন্মায় সেদিকে ভালো ফলনের আভাস থাকে। আম, বেল, ফলমূল— এগুলো তো ঋতুচক্রের ফসল। কাজেই চড়কমেলা বা উৎসবটি বেশ তাৎপর্যময়। বছরের শেষে গাজন— নীল-চড়ক। এই উৎসবকে বাস্তবায়িত করেন গাজন-সন্ন্যাসীর দল। এঁদের নিয়েই বাংলায় প্রবাদবাক্য। 'গাজনের সন্ন্যাসী' বা 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' ইত্যাদি। মন্দার্থে অনেকে কথায় কথায় প্রবাদবাক্যগুলিকে প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু পক্ষকাল ব্যাপী এঁদের কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা বা জীবনধারা সত্যিই প্রশংসনীয়। সত্যিকারের শিবভক্ত যদি হন তাহলে গাজন-সন্ন্যাসীরাই শিবভক্ত। এখানে জাতপাতের কোনও বালাই নেই। অতি শূদ্র বা নিম্নজাতির মানুষের গাজন-সন্ন্যাসী হওয়ার কোনও বাধা নেই। এঁরা ভোগ রান্না করেন। সেই ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়। উত্তরীয় গলায় নিলেই সবাই শিবভক্ত হয়ে যান। এই সময়ের মধ্যে কারও মা বাবা মারা গেলে এঁদের অশৌচ লাগে না। কিন্তু কোথাও 'পাট-ভক্ত মারা গেছেন' এটা যদি কানে আসে তাহলে এঁদের অশৌচ পালতে হয়। দশদিন অশৌচ করেন। উৎসবের পরে গৃহস্থ বা সমাজের স্বাভাবিক নিয়মকানুন এঁরা মেনে চলেন। পক্ষকাল বা কোথাও কোথাও মাসাধিককাল গাজন-সন্ন্যাসীরা শিবভক্ত হয়ে ওঠেন। এমনিতে দেশে বিদেশে কী পারিবারিক, কী প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে হাজার হাজার লাখ লাখ শিবভক্ত রয়েছেন। শৈব মতাবলম্বী মানুষ দেশে বিদেশে প্রচুর রয়েছেন। তাঁদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। কেবল গাজন-নীল-চড়ক নিমিত্ত যাঁরা গাজন-সন্ন্যাসী হয়ে শিবভক্ত হন, তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

পরিশেষে --- গাজন-নীল-চড়কের রীতিনীতি, নিয়মকানুন সর্বত্র যে একইভাবে পালিত হয়, তা নয়। 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ'। আচার অনুষ্ঠান ভিন্ন হতেই পারে। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, উজ্জয়িনী, গুজরাট, কাশ্মীর, নেপাল সহ বিভিন্ন জায়গায় যত শিবমন্দির রয়েছে সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আচার অনুষ্ঠান, নিয়মকানুন আলাদা হতে পারে, এটা অনস্বীকার্য।

পৌরাণিক বা দৈবিক আখ্যান যাই থাক, শিব এবং দুর্গা সবার চোখের সামনে। প্রতিনিয়ত চাক্ষুষ করছেন। এঁরা পুরুষ ও প্রকৃতি। পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পায় শিবদুর্গার মূর্তি মিলেছে। সে যুগের অধিবাসীরাও শিব দুর্গাকে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে দেখেছেন। পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীক হলেন শিবদুর্গা। অর্থাৎ সমগ্র জীবকুলকে প্রত্যক্ষ করে শিব-দুর্গাকে সকলের সামনে উপস্থাপন করা। শিবায়ন নিয়ে অনেক কাহিনি এদেশে রচিত। প্রচলিত বার-ব্রত, ব্রতকথা, নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান, পালা-পার্বণ। আচার-অনুষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় ভিন্নতর হলেও শিবতত্ত্বের মূল সুরটি কিন্তু এক— যা 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা করা।' এই জীবকুল অর্থাৎ যারা চলাফেরা করতে পারে তারা এবং যারা চলাফেলা করতে পারে না অথচ প্রাণ আছে— সে তৃণরাজি থেকে বৃক্ষরাজি— সবার সেবা করা। শিবজ্ঞানে এদের সেবা করা। সকলের সহযোগিতা এবং কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এই জগৎসংসার সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্ হয়ে উঠুক।

তথ্যসহায়তা :

- *শক্তিপদ মাইতি— সুন্দরা, মহিষাদল, পূর্ব-মেদিনীপুর।*
- *হোলির রঙ—সিন্ধুসারস / আবির— সংকলনে— মহিষাদল প্রেসকর্নার—২০১১।*
- *গাজন উৎসব ও চড়কের মেলা— ডঃ প্রদ্যোৎ কুমার মাইতি / মেদিনীপুর-ধর্ম উৎসব মেলা—২০০৪।*
- *শতরূপে দেখি যে তোমায়— সংকর্ষণ মাইতি / স্বস্তিকা-দীপাবলী সংখ্যা/ ৮ নভেম্বর, ২০১০।*

দিদি, একটা ঘুমের অসুধ হবে ?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ,

দিদি, আপনি যেই বছরে ক্ষমতায় এলেন সেই বছরেই স্বৈরাচারী গদ্দাফির মৃত্যু হয়েছিল লিবিয়ায়। তাঁকে স্বচক্ষে দেখিনি। হিটলারের কথাও বইতে পড়েছি। কিন্তু সবাই বলতে শুরু করেছে আপনার মধ্যে নাকি তাঁদের ছায়া আছে। আমি জানি না। দিদি, আপনি অনেক সিনিয়র। আপনিই বলতে পারবেন ওঁরা ঠিক বলছেন কিনা।

কিন্তু দিদি, আমি একটা কথা বলতে পারি। সেটা হচ্ছে আমিও ভাল নেই। বারবার মনে হচ্ছে এটা কোন পরিবর্তনের বাংলা? মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে যেন সিপিএমের রাজত্বেই আছি। সেই এক ধারা! ওরাও বিরোধী কাগজকে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করতে দিত না। বিরোধী সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের ঘৃণার চোখে দেখত, কটূক্তি করত, গায়ে হাতও তুলত। কিন্তু আপনি যখন বিরোধী নেত্রী ছিলেন তখন বরাবর মনে হয়েছে আপনি সাংবাদিকদের ভালবাসতেন। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে ভালবাসতেন।

মনে আছে যেদিন ঝিটকার জঙ্গলে বিস্ফোরণ হলো পশ্চিম মেদিনীপুরে সেদিন রাতের কথা। এক সহকর্মীর চিকিৎসার জন্য সারারাত এস এস কে এম হাসপাতালে ছিলাম। বৃষ্টি ভেজা সেই রাতে আপনিও ছিলেন হাসপাতালে। সারারাত। মনে আছে, ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামের গুলি চালনার রাতে সাংবাদিকদের বাঁচাতে আপনার ভূমিকা। মনে আছে পরদিন দিদির মতো খাওয়ানোর কথা। কতজনের কাছে কতবার সেসবের গল্প করেছি। এখন যখন সবাই আপনাকে ফ্যাসিস্ট বলছে তখন সত্যিই আমার খুব খারাপ লাগছে।

জানি এখনও অনেকের সঙ্গে আপনার সেই সম্পর্ক আছে। তখনও কেউ কেউ স্পেশাল ছিল। তবু সবাইকেই আপনি কাছে টেনে নিতেন। কারণ, সবাইকেই আপনার দরকার হোত। তখন আপনি বিরোধী নেত্রী। স্বপ্নে মহাকরণ।

আজ যেসব কাগজ আপনার কাছের তাদের অনেকেই সেই সময় জন্ম নেয়নি। কেউ কেউ সদ্য জন্মেছে। আর যাদের আপনি গালাগাল করছেন তারা তখনই মধ্য গগনে। এটা সত্যি যে তারা আপনার জনপ্রিয়তাকে নিয়ে বাজার ধরেছে। আবার আপনিও তাদের মাধ্যমে রাজনীতির বাজার ধরেছেন। আজকে যারা বড় শত্রু তাদের সঙ্গে কত গোপন মিটিং করেছেন তা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে।

সেসব দেওয়া-নেওয়ার গল্প থাক। সাংবাদিকতার ছাত্র হিসেবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে অনেক পড়তে হয়েছে। বারবার মনে হয়েছে সেসব কত সাজানো কথা। জার্নালিজম শব্দটার মধ্যেই তো একটা ইজম বা মতবাদ শব্দের যোগ আছে। তাই নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা কথাটাও হয় না। কোনও না কোনও পক্ষ নিতেই হয়। কিন্তু আমার পক্ষ নিলেই সে থাকবে না হলে থাকবে না এটা কোনও থিওরি বলে মনে হয়নি। কিন্তু সেটা দেশে দেশে কম হয়নি। ভারতে বৃটিশ শাসক থেকে ইন্দিরা গান্ধী হয়ে আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ধারা বজার রেখে গেলেন।

গ্রন্থাগারে কোন কাগজ থাকবে, কোনটা থাকবে না সেটা একটা সরকার ঠিক করে দিতেই পারে। কোন কাগজ বিজ্ঞাপন পাবে সেটাও ঠিক করে দিতেই পারে। কিন্তু সেজন্য একটা নিয়ম থাকা উচিত, পছন্দ নয়। নির্দিষ্ট কোনও শর্ত পূরণ করতে পারলে তাদের গ্রন্থাগারে ঠাঁই হবে বলে নিয়ম হতেই পারে। কিন্তু সেই শর্তটা কখনও এমন হতে পারে না যে সরকারের ভাল-মন্দ সব কাজের প্রচার করলে তবেই জায়গা হবে গ্রন্থাগারে। তবেই ভবিষ্যতের জন্য সংগৃহীত হবে। মনে রাখবেন গ্রন্থাগারে খবরের কাগজ শুধু পড়ার জন্য নয়, সেই কাগজের একটা সংগ্রহের গুরুত্ব আছে। যাদের বাদ দিয়েছেন তাদের এতে বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হবে না। কিন্তু ক্ষতি হবে ভবিষ্যতের গবেষকদের।

তবে দিদি, এসব কথা অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি আর নতুন কী বলব? কিন্তু ভয় হচ্ছে অন্য কারণে। আপনি বলেছেন, আগামী দিনে নাকি আপনি এটাও ঠিক করে দেবেন যে, রাজ্যের মানুষ বাড়িতে কোন কাগজ পড়বে আর কোনটা পড়বে না।

দিদি, সত্যি সত্যিই সেটা করবেন নাকি! বড্ড ভয় করছে।

দিদি, ক'দিন আগেই আমার মেয়ে হয়েছে। সে বড় হবে। দিদি আপনিই কি ঠিক করে দেবেন ও কী পড়বে? ওকে কী বিনয় মজুমদারের কবিতা পড়তে পারব? সুকান্ত ভট্টাচার্য? ওকে কী গীতা, ভাগবৎ, পুরাণ পড়াতে পারব? ও কোন কাগজ পড়বে দিদি? আপনি কী সত্যিই ঠিক করে দেবেন? বড্ড ভয় করছে দিদি।

রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকটা পড়াতে পারব দিদি? ধনঞ্জয় বলেছিল, জগৎটা বাণীময়, যেদিকটা শোনা বন্ধ রাখবি, সেদিক থেকে মৃত্যুবাণ ধেয়ে আসবে।

দিদি আমার ছোট্ট মেয়েটা বড় হয়ে রক্তকরবী পড়তে পারবে? সেখানেও তো রবীন্দ্রনাথ রাজরোষ থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন।

দিদি, আপনার বিরুদ্ধে পথে নামার বুকের পাটা নেই এই দুর্বল সাংবাদিকের। কাপুরুষের মতো চোখ, মুখ, কান বন্ধ করে রেখেছি। কিন্তু দুঃস্বপ্নটাকে আটকাতে পারছি না। বারবার মনে হচ্ছে, কী জবাব দেব সন্ততিদের কাছে। পরের প্রজন্মের প্রশ্নের মুখে কোথায় লোকাব মুখ?

বিশ্বাস করুন দিদি, চোখ বুজলেই
শুনতে পাচ্ছি হীরক রাজার সেই
স্লোগান,
যায় যদি যাক প্রাণ,
হীরকের রাজা ভগবান।।
একটা ঘুমের ওষুধ হবে দিদি?

আপনার একান্ত অনুগত
বাধ্য সাংবাদিক

—সুন্দর মৌলিক

চিঠিপত্র

সংখ্যালঘু তোষণ : পরিস্থিতি ও পরিণতি

বিগত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে তথাগত রায় মহাশয়ের 'সংখ্যালঘু তোষণ : পরিস্থিতি ও পরিণতি' শীর্ষক সুচিন্তিত নিবন্ধ বিষয়ে আমার বিনীত নিবেদন। শ্রী রায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলিম তোষণ সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না হিন্দুত্ববাদী দলগুলিও মুসলিম তোষণের ক্ষেত্রে এতটুকু পিছিয়ে নেই। তারা ৩৫৬ ধারা, সাচার কমিশনের রিপোর্ট, হজের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ, কাশ্মীরে হিন্দু বিতাড়ন, ঢালাও ধর্মান্তর, সংখ্যা অনুপাতে মুসলমানদের চাকরি ও প্রতিনিধিত্ব, দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণ, সরকারি কোষাগার থেকে ইমামদের বেতন ও মসজিদ-কবরস্থানের পাঁচিল নির্মাণ ইত্যাদি কোনও বিষয়ে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন করেছে কি? কাশ্মীরে হিন্দুদের শুধু ঘরছাড়া নয় তাদের সম্পত্তি শত্রুর সম্পত্তি বলে আইন করা হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী দলগুলি এনিয়ে ব্যাপক আন্দোলন করেনি। পার্লামেন্টেও না পার্লামেন্টের বাইরে না। বছরে একটা দিন কাশ্মীর দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ওই দিন নেতারা গরম গরম বক্তৃতা দেন, ব্যাস তারপরে বাকি ৩৬৪ দিন সব চুপচাপ। অপর পক্ষে মুসলমানরা যে আন্দোলন শুরু করেন তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যান। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে মুসলমানরা সমানে তাদের ক্ষোভ জারি রেখেছে। অনেকে জানেন না বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার ক্রোধে মুসলমান মহিলাদের শাড়ির উপর কালো উড়াল বা কালো বোরখা পরতে বাধ্য করা হয়েছে যেমন করা হয়েছিল খিলাফৎ আন্দোলনের সময়।

জনতা দলের নেতা সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী কিছুদিন আগে বলেছিলেন, মুসলমানরা ভারতের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে চান না। এই সরল সত্য কথাটুকু বলার জন্যে মুসলমানরা তাঁকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। হিন্দুত্ববাদীরা নীরব। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন দেবী সরস্বতীকে দেখলে তাঁর কাম জাগে। এই অবমাননাসূচক বক্তব্যের বিরুদ্ধে একজন আই পি এস অফিসার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা চুপ থেকেছেন, তাঁকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা তো দূরের কথা। এমন ক্ষেত্রে কিন্তু মুসলমানরা একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ত। ভারতে বছরে গড়ে ৪,০০০ হিন্দু ছেলে বা মেয়ে মুসলমান মেয়ে বা ছেলেকে বিবাহ করে মুসলমান হচ্ছে, হিন্দুত্ববাদীরা উদাসীন। প্রতিদিন মুসলমানরা দেশের কোথাও না কোথাও দাঙ্গা বাধাচ্ছে; হিন্দুত্ববাদীরা চুপ।

—কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী, দমদম, কলকাতা-৩০।

রাজ্যের কোষাগার আই সি ইউ থেকে ভেন্টিলেশনে

নির্বাচনে জয়লাভ করে কথামৃতের ন্যায় যে বাণী প্রচার করেছিলেন, এক প্রকার মিথ্যাবাদীর ন্যায়, যে বদলা নয় বদল চাই তার থেকে সম্পূর্ণ একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে উনি বদলের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ বদলার যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন তা এককথায় ঘৃণ্য। উত্তরপ্রদেশে বিএসপি নেত্রী মায়াবতী ও বিজেপির কল্যাণ সিংহের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর আসনে প্রথম ছ'মাস মায়াবতী পরের ছমাস কল্যাণ সিং। কিন্তু দুর্জনের ছলের অভাবের ন্যায় প্রথম ছ'মাস রাজ্য চালাবার পর মায়াবতী বিশ্বাস হন্তার ন্যায় কুর্সী ছাড়ল না, ফল হলো পতন। পশ্চিমবঙ্গের নেত্রীও নিজ জেদ বজায় রেখে নির্বাচনে আসন সমঝোতা করে (কংগ্রেসের সঙ্গে) সিপিএমকে হারান। তার পর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে, মায়াবতীর ন্যায়, কংগ্রেসকে 'ব্যাককিক' মারতেও দ্বিধা করছেন না। ফল হলো দুটি রাজনৈতিক শিবির হলো নেত্রীর বিরোধীপক্ষ।

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা

দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা গেছে। যেমন পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। সময় সময় দূরদর্শনে আলোচনাচক্রে অংশ নেন এবং সময় বিশেষে বিভিন্ন ব্যানারে শোভাযাত্রায় অংশ নেন, কোনও সিদ্ধান্তের সমর্থনে বা প্রতিবাদে।

কিন্তু এখন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যে চক্রান্তের জাল বোনা হয়েছে ও হচ্ছে তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি এবং প্রশাসনকে সজাগ করতে সেই সকল বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য কোনও ভূমিকা নেই কেন, সাধারণ সচেতন মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগছে। দেশভক্তদের বিশ্বাস বুদ্ধিজীবীরা কলম ধরলে বহুমুখী সমস্যার সমাধানের কিছু কিছু রাস্তা অবশ্যই বেরোতে পারে। প্রশাসনকে নড়েচড়ে বসতেই হবে। কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করছি। যেমন—মাওবাদী-নকশালবাদী সমস্যা, জালনোটে দেশ ভরে যাওয়ার সমস্যা, অবৈধ মারাত্মক অস্ত্রের ব্যাপক আমদানী, নিয়মিত যথেচ্ছ সংখ্যায় গো-সম্পদ পাচার। অবিরাম পাকিস্তান ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ, সর্বত্র কমবেশি গুণ্ডাভাতা দিতে বাধ্য করা, নিত্যদিন চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ। এছাড়াও বহু প্রকার সমস্যায় দেশ জর্জরিত। কমবেশি সমস্ত মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে দেশে সত্যই কী কোনও প্রশাসন কাজ করছে? এর নাম কী গণতন্ত্র?

জানা যায় ৭০-এর দশকে সরকারী নির্দেশ ছিল সুরক্ষাবাহিনীর জওয়ানরা তখনই কেবলমাত্র গুলি চালাতে পারবে যখন আগে জেহাদীরা শত্রুপক্ষের তরফ থেকে গুলি চালাবে। বিষয়টা সাধারণ মানুষ জানত না। প্রশ্ন এই যে, জেহাদীরা যদি আগে গুলি চালাবার সুযোগ নিয়ে থাকে তাহলে তো আমাদের সুরক্ষা কর্মীদের দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। গত কয়েক মাস আগে আমাদের সীমান্ত সুরক্ষাবাহিনীকে (বি এস এফ) গুলি চালাতে নিষেধ করা হয়েছে। আর সেই সুযোগে পাচারকারীরা হাতে স্বর্গ পেয়ে উল্টে আমাদের সুরক্ষাকর্মীদের গুলি করে ও অস্ত্রাঘাতে মেরে ফেলেছে।

সংবাদপত্রে ছবির মাধ্যমে দেখা গেল আমাদের সীমান্ত সুরক্ষা কর্মীরা হাতে লাঠি ও বাঁশের তৈরি ঢাল নিয়ে সীমান্ত কর্মরত। এই রকমই চলতে থাকবে না এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিজীবী সমাজ জাগ্রত হয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তনে সক্রিয় হবেন?

—অমরকৃষ্ণ ভদ্র, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

আরবী মন, পাকিস্তানি হৃদয় : প্রতিবাদের পরিচয়

নীতিন রায়

পিছন দিকে চলেছি আমরা। মধ্যযুগ আবার নেমে আসছে ভারতবর্ষে। লেখার স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা, মুসলমান মৌলবাদীদের দাপটে হরণ হতে চলেছে। বহুদিন পূর্বে ''দ্যা ডেকান হেরাল্ড'' পত্রিকায় 'মহম্মদ দ্যা ইডিয়ট' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পের বিষয়বস্তু আবদুর রহমান নামে এক ঘোড়ার গাড়ীর চালকের করুণ অবস্থা। তার পুত্র মহম্মদ আবদুর রহমানের দেখভাল করে না। তাই নিয়ে ওই গল্প। কিন্তু ইসলাম বিরোধিতার অভিযোগ এনে ওই পত্রিকা অফিসটি ভাঙচুর হয়। তৎকালীন দেড় কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করে জেহাদিরা। আবার কয়েক বছর আগে 'দি স্টেটসম্যান পত্রিকা'কে ও একই অবস্থায় পড়তে হয়। তিন দিন ধরে রাস্তাঘাট বন্ধ করে মৌলবাদীরা দাবি জানাতে থাকে। প্রশাসন মাথা নত করে। 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকাকে ক্ষমা চাইতে হয়। মুসলমান মৌলবাদীদের চাপে তসলিমা নাসরিনকে চলে যেতে হয়। তাণ্ডব চালায় মুসলমান মৌলবাদীরা। রাজস্থানে সলমন রুশদির বইমেলায় আসার কথা। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে সলমন রুশদির আসা বন্ধ করে রাজস্থান সরকার। মুসলমান মৌলবাদীরা বই মেলায় মিছিল করে যায় এবং সলমন রুশদির না আসা কার্যকর করে। সাম্প্রতিক নির্বাচনের সময় ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভে সলমন রুশদির বক্তব্য রাখার কথা। তাই জেনে কংগ্রেস 'ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভ' বয়কট করে। সংখ্যালঘু ভোট বড় বালাই, সংখ্যালঘু ভোটের কথা মনে করে সব হচ্ছে। সংবিধানের মর্যাদা যেন কিছুই নয়।

জেহাদিদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িগুলির একটি।

সম্প্রতি কলকাতায় রাস্তায় যে ঘটনা ঘটে গেলে তা নূতন নয়। বিভিন্ন ঘটনায় ইসলামিক জেহাদিরা রাস্তায় নামছে। ২০ মার্চের ঘটনাও অনুরূপ। ১৯ মার্চ ২০১২ টেলিগ্রাফ পত্রিকায় একটি ছোট ছবি প্রকাশ হয়। প্রকাশিত হয় পুনম পান্ডের টুইটার থেকে। ক্রিকেট মাঠ। বিষ্ণুর ছবির সামনে মাথা নত করছেন এক পাকিস্তানি খেলোয়াড়। বিষ্ণুর ফটোটি ধরে রেখেছে এক নগ্ন মহিলা। এটা নাকি ইসলাম বিরোধী।

সম্প্রতি কলকাতায় রাস্তায় যে ঘটনা ঘটে গেলে তা নূতন নয়। বিভিন্ন ঘটনায় ইসলামিক জেহাদিরা রাস্তায় নামছে। ২০ মার্চের ঘটনাও অনুরূপ। ১৯ মার্চ ২০১২ টেলিগ্রাফ পত্রিকায় একটি ছোট ছবি প্রকাশ হয়। প্রকাশিত হয় পুণম পান্ডের টুইটার থেকে। ক্রিকেট মাঠ। বিষ্ণুর ছবির সামনে মাথা নত করছেন এক পাকিস্তানি খেলোয়াড়। বিষ্ণুর ফটোটি ধরে রেখেছে এক নগ্ন মহিলা। এটা নাকি ইসলাম-বিরোধী। প্রকারান্তরে কোনও পাকিস্তানি খেলোয়াড়ের হেনস্থা চায় না প্রতিবাদকারী ও তার সমর্থকেরা।

২০ মার্চ পার্ক সার্কাসের সাত মাথার মোড়ে জড়ো হয় জেহাদিরা। বেলা আড়াইটে নাগাদ পদ্মপুকুরে জড়ো হওয়া একদল যুবক তাড়া খেয়ে সাত মাথার মোড়ে চলে আসে। রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেয়। রাত্রি ১১টা পর্যন্ত অবরোধ চলে। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর হয়। প্রাইভেট গাড়িও ভাঙচুর হয়। অনেক সাংবাদিক মার খান। বাস থেকে নামিয়ে যাত্রীদের মারধোর করা হয়। দক্ষিণ কলকাতা অচল হয়ে পড়ে, পরীক্ষার্থীরা আটকে যায়। তারা দাবি জানায় টেলিগ্রাফ পত্রিকা বন্ধ করে দিতে হবে, না হয় ক্ষমা চাইতে হবে। মডেল পুণম পান্ডেকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় গাড়ী ভাঙচুর হয়। এন ডি টি ভি জানিয়েছে মল্লিকবাজারও উত্তপ্ত ছিল। আসরে নেমেছিলেন ইদ্রিশ আলি ও জাভেদ খান।

পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরবে, সারাদিন ধকলের পর মানুষ কর্মস্থল থেকে ফিরবে, অথচ রাস্তাঘাট বন্ধ, হাসপাতালে রোগী যেতে পারছে না। দক্ষিণ কলকাতা যানজটে নাকাল। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জেহাদি সন্ত্রাস দেখেছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও বিমান বসু তোষামোদের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। যেন সংখ্যালঘু দেবতার কোপে না পড়েন কেউই। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন ইসলামিক ভাইরা ততক্ষণ তাদের ব্যবহার করবে যতক্ষণ তাদের প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধীকেও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল মুসলিম লীগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

ধর্ম নিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা একে অপরকে দুষছেন। আড়ালে থেকে যাচ্ছে জেহাদিরা। তারা মুচকি হাসছে। কিন্তু এ বাংলা কেদার রায়ের বাংলা। এ বাংলা প্রতাপাদিত্যের বাংলা, এ বাংলা রাজা সীতারামের, এ বাংলা চিলা রায়ের বাংলা। দেরিতে হলেও বাংলার হিন্দুরা জাগছে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ও জেহাদি শক্তি মহাভারতের কালখণ্ডে আসুরিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হবে। বাস্তবতাকে অনুধাবন করে কট্টর মৌলবাদ-এর মোকাবিলা করা দরকার।

গগৈ 'উন্নয়ন'-এর দাবি করলেও অসমে বিপিএল-দের সংখ্যা জাতীয় গড়ের থেকে বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ রাজ্যে আর্থিক উন্নয়ন ভালোমতো হয়েছে বলে দাবী করলেও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট তাঁর দাবীকে অসার এবং অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন করেছে। প্ল্যানিং কমিশনের বিবরণে ২০০৯-১০-এ অসমের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যা ১ কোটি ১৬ লক্ষ অর্থাৎ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৩৭.৯ শতাংশ বলা হয়েছে। ২০০৪-০৫-এ এই সংখ্যাটা ছিল ৯৭ লক্ষ অর্থাৎ ৩৪.৪ শতাংশ।

প্ল্যানিং কমিশনের প্রতিবেদন মোতাবেক অসমের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যাটা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। অথচ ২০০৪-০৫ সালে এই হিসাবটা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশ কম ছিল। শহর এলাকায় ৪২ শতাংশ এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে ২৫.৫ শতাংশ। যদিও কমিশন দারিদ্র্যসীমার যে সংজ্ঞা ঠিক করেছে, তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের মাথাপিছু মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতেই 'দারিদ্র্যসীমা' ঠিক হয়। যা গ্রামীণ ক্ষেত্রে মাসিক মাথাপিছু গড় আয় ৬১১.৭ টাকা এবং শহর-এলাকায় ৮৭১ টাকা মাত্র।

সারা দেশের হিসেবে আগের তুলনায় ২০০৯-১০-এ ৭.৩ শতাংশ কমে ২৯.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০-এর মধ্যে গ্রামীণ ক্ষেত্রে শহর-এলাকার চেয়ে দ্রুতহারে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যাটা কমছে। ২০০৯-১০-এর হিসেবে দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যা ৩৪.৪৭ কোটি, যা ২০০৪-০৫-এ ছিল ৪০.৭২ কোটি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় ৪১.৮ শতাংশ এবং শহর এলাকায় ২৫.৭ শতাংশ ভারতবাসী দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করতেন। যা ৯০০৯-১০ বছরে কমে হয়েছে যথাক্রমে ৩৩.৮ এবং ২০.৯ শতাংশ।

দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যা ১০ শতাংশ হিসেবে কমেছে হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, সিকিম, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং উত্তরাখণ্ডে।

প্ল্যানিং কমিশন তেণ্ডুলকর কমিটির নির্দিষ্ট মাপকাঠি— শিক্ষা ও স্বাস্থ্য- রক্ষায় খরচ এবং কত ক্যালোরি গ্রহণ করেন তার উপর। সংগৃহীত তথ্য অনুসারে ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে গ্রামীণ ক্ষেত্রে শিখদের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী সর্বাপেক্ষা কম, মাত্র ১১.৯ শতাংশ। আবার, শহর এলাকায় খৃস্টানদের মধ্যে সবচেয়ে কম— ১২.৯ শতাংশ।

গ্রামীণ ক্ষেত্রে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি হলো এদেশের সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজ। কয়েকটি রাজ্য অনুসারে তাদের সংখ্যা সেই রাজ্যে বিপিএল-দের মধ্যে নিম্নরূপ। অসম— ৫৩.৬ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশ--- ৪৪.৪ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গ— ৩৪.৪ শতাংশ, আর বিজেপি শাসিত গুজরাটে ৩১.৪ শতাংশ। সারা ভারতবর্ষ ধরলে বি পি এল তালিকায় মুসলমানদের অনুপাত ৩৩.৯ শতাংশ। একইরকমভাবে সমাজগত ভাবে সারা ভারতে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ শ্রেণী হলো— তপশিলি জাতিভুক্ত জনসমষ্টি। তারা হলো ৪৭.৪ শতাংশ, তারপরই তপশিলি জনজাতিরা— ৪২.৩ শতাংশ। আর বহুচর্চিত ওবিসি-দের অনুপাত হলো ৩১.৯ শতাংশ। সবমিলিয়ে গ্রামীণ ক্ষেত্রে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যাটা ৩৩.৮ শতাংশ। শহর এলাকায় সমাজগতভাবে পশ্চাৎপদ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের মধ্যে তপশিলি জাতিদের অনুপাত ৩৪.১, তারপর তপশিলি জনজাতিদের ৩০.৪ শতাংশ, ওবিসি-রা ২৪.৩ শতাংশ, সব মিলিয়ে ২০.৯ শতাংশ।

পেশাগতভাবে দেখলে গ্রামীণক্ষেত্রে কৃষিশ্রমিকদের ৫০ শতাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। অন্যান্য শ্রমজীবিদের মধ্যে এই হার চল্লিশ শতাংশ। ক্যাজুয়্যাল শ্রমিকদের ৪৭.১ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে আছেন।

তবে যদি সংসদে চাপে পড়ে সরকার ও প্ল্যানিং কমিশন দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞা অদলবদল করে তাহলে অবস্থাটা পালটে যাবে। এই সরকারি পরিসংখ্যানই তরুণ গগৈ, মায়াবতী-মুলায়ম সিং যাদব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বোপরি কংগ্রেসের মুসলমানদের জন্য দরদে উথালপাথাল হওয়ার বাস্তব চিত্রটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এখানেও সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন ওঁদের চোখে মুসলিম-অত্যাচারী বলে চিহ্নিত নরেন্দ্র মোদী। কেননা তাঁর রাজত্বেই সবচেয়ে কম শতাংশ মুসলমান দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। তবে, এরপরও মোদীকে মুসলমান-বিরোধী বলে প্রচার করা হবে নাহলে ভোট-ময়দানে মুসলিম ভোট পকেটস্থ করার দৌড়ে ওঁরা পিছিয়ে পড়বেন যে!

পরহিতে জীবন উৎসর্গ করার দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন চুয়াল্লিশজন তরুণ

রমাপ্রসাদ দত্ত।। 'ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান/নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিও প্রাণ'। রবীন্দ্রনাথের বাণী তাঁদের উদ্বোধিত করেছিল কিনা জানা নেই, তবে অন্তরে ধর্মের ডাক হয়তো পৌঁছেছিল সেভাবেই। তা না হলে জীবনে কৃতী সফল কিছু তরুণ বিলাস বৈভবের জীবন স্বেচ্ছায় ছেড়ে সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রতে দীক্ষা নেবেন কেন? আসলে রক্তের ভিতরে, মনের গভীরে কখন কি খেলা করে যার পূর্বানুমান কঠিন। হয়তো কঠিন বলেই জীবন বড় বৈচিত্র্যময় রূপ নেয় গতানুগতিকতার ছক বাঁধা পথ ছেড়ে।

ওইভাবেই ৩১ বছর বয়সী ধর্মেশ প্যাটেল ধর্মের টানে সব ছেড়েছুড়ে দিলেন। পূর্বাশ্রমের নাম ত্যাগ করে নতুন পরিচয় হলো সন্দিপনী ভগত। তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেকসাসের হাউসটনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছিলেন। মোটা অঙ্কের বেতন, অনেকরকম সুযোগসুবিধে। বাবা গুজরাট সরকারের কর্মী। নাম সবজিভাই প্যাটেল। ধর্মেশ তাঁর তিন ছেলের একজন। আমেরিকায় চাকরি করার সময় বছরে পারিশ্রমিক মিলত ভারতীয় মুদ্রা হিসেবে ৭০ লক্ষ টাকা। সন্ন্যাসী হওয়ার আগেও পেয়েছেন। বলেছেন : 'ধর্মের ডাক পেয়েছিলাম আগেই। যেহেতু আমাদের পারিবারিক অবস্থা ভালো ছিল না সেজন্যে কিছুদিন অপেক্ষা করেছি। পরিবারকে যতটা সম্ভব সাহায্য করতে চেয়েছি। প্রায় নাটকীয়ভাবেই আমার মা পাঁচ বছর আগে ক্যানসার থেকে আরোগ্যলাভ করেন। সেটাই যেন ছিল আমার কাছে ঈশ্বরের বার্তা। যিনি আমার মাকে সুস্থ করেছিলেন, আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম।' ধর্মেশ সন্ন্যাস নেওয়ার কিছুদিন আগে থেকেই ধর্মীয় প্রেরণামূলক বই পড়েছেন অনেক। ছেলেবেলা থেকেই বাড়ির লোকজন লক্ষ্য করেছিলেন ধর্মেশের বিশেষ টান রয়েছে ধর্মের প্রতি। সেজন্যেই বাড়ির কেউ বিস্মিত হননি তাঁর সিদ্ধান্তে।

ধ্রুমিল উপাধ্যায়ের বয়স ২১ বছর। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি বিদ্যায় পাঠ নেওয়ার সময় গভীর টান অনুভব করেন ধর্মের প্রতি। সন্ন্যাস নেওয়ার পর নাম হয় ভরদ্বাজ ভগত। ধর্মের আহ্বান শুনতে পান গুজরাটের স্বামীনারায়ণের অনুগামীদের এক সম্মেলনে। গত বছর জুন মাসে সম্মেলন বসেছিল নিউজিল্যান্ডে। সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্যে যাওয়ার একঘণ্টা পরে ধ্রুমিলের বাবা দর্শনভাই উপাধ্যায় একটা খাম দেখতে পেলেন সিডনির বাড়িতে পূজার স্থানে ভগবান স্বামী নারায়ণের প্রতিকৃতির নিচে। চিঠিতে লেখা আছে দু'জনের নাম। ধ্রুমিলের চিঠি। লিখেছেন বাবা আর মাকে। বাবা দর্শনভাইয়ের বয়স ৪৬, মা পারুলবেনের বয়স ৪৩। ছেলে লিখেছে, 'বাবা/মা, আমি সত্যিকারের আকর্ষণ অনুভব করছি আধ্যাত্মিক দিক থেকে। আমি স্বামীনারায়ণের অনুগামী সন্ন্যাসী হয়ে সমাজসেবা করতে চাই। মানি এটা খুব কঠিন সিদ্ধান্ত, যেহেতু আমি তোমাদের একমাত্র সন্তান। তবে আমার বিশ্বাস তোমরা স্বামীনারায়ণের বহুদিনের ভক্ত হিসেবে আমার সিদ্ধান্তে সম্মতি জানাবে।' তিনদিন বাদে সম্মেলন শেষে ধ্রুমিল যখন ফিরলেন, তখন জানতে পারলেন তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণে বাবা-মা সম্মত। ধ্রুমিলের এখন নাম ভরদ্বাজ ভগত। একসময় চলচ্চিত্র অভিনেতা ঋত্বিক রোশনের ভক্ত ছিলেন, সামনে আদর্শ ছিল চলচ্চিত্র জগতের সেই নায়ক। এখন তিনি সন্ন্যাসী। পুরোপুরি নিরামিষাশী। ধর্ম আর সমাজ কল্যাণ তাঁর জীবনকে অন্যভাবে পূর্ণ করেছে। স্বামীনারায়ণের অনুগামী সন্ন্যাসী ৯১ বছর বয়সী প্রমুখ স্বামী মহারাজের কথা শুনে আর রীতিপদ্ধতি দেখে আকর্ষণবোধ করেন ধ্রুমিল ২০০৫ সাল থেকে। শেষে সন্ন্যাস নেন। মা পারুলবেন বলেছেন, 'ভগবানের কাছে আর কি চাইবার আছে, তিনি নিজে যখন আমাদের ছেলেকে তাঁর কাছে নিয়েছেন।'

গত ১৪ মার্চ ৪৩ জন যুবক ওইভাবে নিজেদের সম্পদ-সম্ভাবনায়ভরা জীবন

বিলাস বৈভবের নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে সেবাব্রতী নবীন সন্ন্যাসীরা।

থেকে সরে এসে সেবার ব্রত নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। সৌরাষ্ট্রের ভাবনগরের কাছে সালংপুর মন্দিরে শ্রীঅক্ষয়পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থার অধিবেশনে এই পরিবর্তন ঘটে এতগুলি তাজা তরুণের। মন যখন একবার ধর্মমুখী হয়েছে তখন তাঁদের আর আটকে রাখা সম্ভব নয়। এই ৪৩ জন নব সন্ন্যাসীর মধ্যে ১৭ জন ইঞ্জিনিয়ার, তিনজন চিকিৎসক, আর বারোজন অনাবাসী ভারতীয়। ৪৪তম সন্ন্যাসীর নাম শমীক ভগত। ২৪ বছর বয়স। পূর্বাশ্রমের নাম জয়েশ চেখেসি।

সন্ন্যাস নেওয়ার আগের দিন অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীরা তালিম দেন কীভাবে মাথায় পাগড়ি বাঁধতে হবে, দাড়ি কাটতে হবে, স্নান করতে হবে। দীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল সন্ধ্যেবেলা। তার আগে উপবাসে থাকতে হয়েছিল হবু সন্ন্যাসীদের। সন্ন্যাস নেওয়ার আগের দিন তাঁরা কাটিয়েছেন পরিবারের লোকজনের সঙ্গে শেষবারের মতো। দীক্ষা-দিবসে বহুজন সমাবেশে প্রমুখ স্বামী একজনের পর একজনকে আশীর্বাদ করেন। তারপর তাঁরা পান নতুন সাদা বস্ত্র। বয়স্ক সন্ন্যাসীরা আলিঙ্গন করে নবীনদের স্বাগত জানান। স্বামী ব্রহ্মবিহারী জানান, 'সন্ন্যাস নেওয়া যায় না ২১ বছর না হলে। সেটাই বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত প্রথা। সাদা পোষাক পরে যাঁরা সন্ন্যাসী হলো তাঁরা তালিম পাবেন। এরপর ইচ্ছে হলে গৃহে ফিরে যেতে পারেন। এক বছর বাদে পাবেন গেরুয়া পোশাক।'

বাচাসনবাসী শ্রী অক্ষয় পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থায় ৯০০ জনের বেশি সন্ন্যাসী আছেন সারা পৃথিবীতে। আর ১৫ লক্ষ অনুগামী। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক। বিশাল বিশাল মন্দির তৈরি হয়েছে। দিল্লীতে হয়েছে অক্ষরধাম মন্দির। অনুগামীরা জনসেবার কাজ করেন নিষ্ঠায়। ২০০১ সালে গুজরাটের ভূমিকম্পের পর সেবার কাজ করেছে দারুণভাবে এই সংস্থা। ২০০৫ সালে সুনামির সময়েও সংস্থার কাজ ছিল প্রশংসনীয়। ২০০২ সালে গান্ধীনগরে অক্ষরধাম মন্দির আক্রমণের পর শান্তিরক্ষায় উদ্যোগী হন সংস্থা। দীক্ষা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতের প্রথম বৃহৎ কম্পিউটারের স্রষ্টা বিজয় ভাটকর। তিনি বলেছেন, 'আমি প্রমুখ স্বামীকে প্রণাম করি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্যে।' *[সূত্র : ইন্ডিয়া টুডে, ২ এপ্রিল ২০১২]*

বাবা'র লঙ্গরখানা।

‘বাবা’র লঙ্গরখানা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তিনটে চাপাটি, আলুচানা, হালুয়া, একটা কলা এবং এক প্যাকেট মিষ্টি বা বিস্কুট। লঙ্গরখানার খাদ্য-তালিকা হিসেবে নেহাত-ই বাড়াবাড়ি। কোথায় খিচুড়ি আর ঘ্যাঁটে-ই কাজ সারা হয়ে যায়, তা নয় এত! পাঠক অপেক্ষা করুন বিস্মিত হওয়ার আরও কিছু বাকি রয়েছে। স্থান মাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে। যে স্থানে এই লঙ্গরখানাটা অবস্থিত, সেটা চণ্ডীগড় অর্থাৎ কিনা পাঞ্জাবের রাজধানী। ভাত-টাতের চল অত নেই। সুতরাং খিচুড়ির পরিবর্তে চাপাটি-র ব্যাপারটা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু ঘ্যাঁটের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট আলুচানা, হালুয়া, তারপর ফাউ হিসেবে মিষ্টি, বিস্কুট কিংবা কলা দেবার রহস্যটা কি?

বুঝতে গেলে জানতে হবে, ‘বাবা’-কে। এই ‘বাবা’ হলো আদরের নাম। আসল নাম জগদীশ লাল আহুজা। চণ্ডীগড়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব্ মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের (পি জি আই এম ই আর) বাইরের দেওয়ালে পোস্টার দেখবেন— ‘জগদীশলাল আহুজা, পিজিআই ভাণ্ডারেওয়ালে, চণ্ডীগড়’। সন্ধ্যে সাতটা। সূয্যিমামা অস্তে যাবার সময় থেকেই ভিড় জমতে থাকে ওই পোস্টারের আশ-পাশে। প্রতীক্ষা কখন ‘বাবা’ আসবেন। চণ্ডীগড়ে রাস্তায় ছাগলের ঘোলাটে চোখের মতো ভেপার ল্যাম্পগুলো তখন সবে জ্বলতে শুরু করেছে। কিন্তু পি জি আই এস ই আর-এর বাইরে জড়ো হওয়া হাজার হাজার মানুষের চোখে তখন যেন হাজার ওয়াটের বাল্বের আলো। একটা টেবিল পেতে, তার ওপর অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোসন রেখে একদম নিখরচায় খাদ্য পরিবেশন— এককথায় এটাই হলো বাবার লঙ্গরখানা। গত ১১ বছর ধরে সরকারি কলেজের লাগোয়া দেওয়ালজুড়ে বসা এই লঙ্গরটিকে বাজার চলতি আর পাঁচটা লঙ্গরখানার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না মোটেই। চণ্ডীগড় সহ পাঞ্জাবের যা রীতি তাতে স্থানীয় গুরুদ্বার কিংবা জন্ম শ্রাদ্ধ কিংবা বিবাহ ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে কেউ হয়তো লঙ্গরখানা খুলে থাকেন। সেদিক দিয়ে ‘বাবা’র লঙ্গরখানা’ একেবারেই স্বতন্ত্র। এখানে শুধু স্থানীয় গরীব-দুঃস্থ মানুষকেই অন্নদান থুড়ি চাপাটি দান করা হয় না, সরকারি হাসপাতালটিতে (পি জি আই এম ই আর) দূর-দূরান্ত থেকে রোগীর যে আত্মীয়রা ভিড় করেন তাদেরও চাপাটি-সেবা করা হয়।

আদতে পাকিস্তানের পেশোয়ারের লোক আহুজা মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১২টা টাকা মাত্র পকেটে নিয়ে চলে আসেন এপারে। চণ্ডীগড়ে ছিলেন পাঁচের দশকের গোড়া থেকেই। সাতের দশকের শেষদিক থেকে আছেন মাণ্ডী-তে। মাণ্ডীতে থাকার সময়-ই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। তিনি দেখেন ফল ও সবজী পরিবহনে নিযুক্ত শিশু শ্রমিকরা তাদের পরিবারের মুখে অন্ন জোগাতে গিয়ে নিজেরাই অভুক্ত অবস্থায় খেটে মরছে। ১৯৭৯ সালেই ছোটদের জন্য শুরু করে দেন একটি লঙ্গরখানা।

এখন তাঁর বয়স ৭৮। নিজের ব্যবসার ভার আপাতত সন্তানের ওপর। তাঁর অবর্তমানে যাতে লঙ্গরখানা মুখ থুবড়ে না পড়ে তার জন্য স্বতন্ত্র তহবিল করে রেখেছেন তিনি। ’৬০-এর দশকে মাত্র কয়েক হাজার টাকা নিয়ে আর্তের সেবায় নেমেছিলেন তিনি। আজ সেই টাকার পরিমাণ নিদেনপক্ষে কয়েক কোটি টাকা। প্রতিদিন সকাল থেকেই মাইনে করা জনা বারো কর্মচারী লেগে যান লঙ্গরখানার এলাহি আয়োজনে। ১ কুইন্টাল ময়দায় ৫০০০ চাপাটি তৈরি করা তো আর ছেলের হাতের মোয়া নয়! চণ্ডীগড়ে গেলে দেখতে অবশ্যই ভুলবেন না ‘বাবা’র লঙ্গরখানা; খেতেও!

বিদ্যালয় স্তরে ধর্মশিক্ষা : পথ দেখাচ্ছে বাংলাদেশ

বিশ্বনাথ দাস

ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতের নাগরিক হিসাবে একটি রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হলো— দেশের সংবিধানে সকল ধর্মমতের সমান স্বীকৃতি; ধর্মমত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের সমান অধিকার, মর্যাদা এবং সুযোগ; কোনও ধর্মমতের প্রতি রাষ্ট্রের বিশেষ পৃষ্ঠপোষণ থাকবে না।

প্রশ্ন হলো, নাগরিকদের ধর্মচেতনা জাগ্রত করার ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা কী? শিক্ষানীতিতে এর কি কোনও প্রতিফলন আছে? পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ও ক্রিশ্চান মিশনারি পরিচালিত কয়েকটি শিক্ষায়তন এবং অন্যদিকে মাদ্রাসাগুলিতে ধর্মশিক্ষার কিছু সুযোগ থাকলেও তা নামমাত্র এবং পাঠ্যসূচি-বহির্ভূত। সরকারি বা সরকার-পোষিত বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার প্রত্যক্ষ কোনও আয়োজন নেই।

অন্যদিকে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছিল ঐসলামিক রাষ্ট্র। ১৯৭১ খৃস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার সময় থেকে এটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী ওই দেশে ৯০ শতাংশ মুসলমান, ৮ শতাংশ হিন্দু, ১.৫ শতাংশ বৌদ্ধ ও ক্রিশ্চান এবং ০.৫ শতাংশ উপজাতি। এই বাংলাদেশে অতি সম্প্রতি দিন পনেরো ঘুরে আসার সূত্রে এই ধর্মনিরপেক্ষতার একটি বিশেষ দিক বর্তমান লেখকের চোখে পড়ল। সেটি হলো— বিভিন্ন মতের ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা নয়, বরং বিদ্যালয় স্তরে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব কয়টি প্রধান ধর্মমতাবলম্বী (মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ক্রিশ্চান) পরিবার থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের ধর্মশিক্ষা বিষয়ে একটি আবশ্যিক পত্র পড়তে হবে এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেটিতে পাশ করলে তবেই উত্তীর্ণ হওয়া যাবে উচ্চতর শ্রেণীতে। এই পত্রটিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষায় পূর্ণমান ৫০, এতে ১৭ পেলে পাশ; পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণিতে পূর্ণমান ১০০, এতে ৩৩ পেলে পাশ।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তা নিয়েই বর্তমান আলোচনা।

[দুই]

বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী কোনও বিদ্যালয়ে তৃতীয় থেকে দশম পর্যন্ত কোনও শ্রেণীতে মুসলমান ছাড়া যদি একজনও হিন্দু, বৌদ্ধ বা ক্রিশ্চান ছাত্র/ছাত্রী থাকে, তাহলে সেই বিদ্যালয়ের সেই শ্রেণীতে সংশ্লিষ্ট ধর্মশিক্ষার আয়োজন রাখতে হবে। অন্য সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের মতো ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ক্রিশ্চান ধর্মশিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশকও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। 'মুখবন্ধ'-এ বোর্ডের চেয়ারম্যান মন্তব্য করেছেন : "ধর্মশিক্ষা মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের অন্যতম মাধ্যম। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প নেই।"

বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী কোনও বিদ্যালয়ে তৃতীয় থেকে দশম পর্যন্ত কোনও শ্রেণীতে মুসলমান ছাড়া যদি একজনও হিন্দু, বৌদ্ধ বা ক্রিশ্চান ছাত্র/ছাত্রী থাকে, তাহলে সেই বিদ্যালয়ের সেই শ্রেণীতে সংশ্লিষ্ট ধর্মশিক্ষার আয়োজন রাখতে হবে। অন্য সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের মতো ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ক্রিশ্চান ধর্মশিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশকও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। 'মুখবন্ধ'-এ বোর্ডের চেয়ারম্যান মন্তব্য করেছেন : "ধর্মশিক্ষা মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের অন্যতম মাধ্যম। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প নেই।"

পর্যন্ত কোনও শ্রেণীতে মুসলমান ছাড়া যদি একজনও হিন্দু, বৌদ্ধ বা ক্রিশ্চান ছাত্র/ছাত্রী থাকে, তাহলে সেই বিদ্যালয়ের সেই শ্রেণীতে সংশ্লিষ্ট ধর্মশিক্ষার আয়োজন রাখতে হবে। অন্য সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের মতো ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ক্রিশ্চান ধর্মশিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশকও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। 'মুখবন্ধ'-এ বোর্ডের চেয়ারম্যান মন্তব্য করেছেন : "ধর্মশিক্ষা মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের অন্যতম মাধ্যম। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প নেই।" ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম—দশম শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট চারখানি হিন্দুধর্ম বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছিল বর্তমান লেখকের। এগুলিতে আলোচিত বিষয়বস্তু থেকে সমগ্র পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

উক্ত চারটি পুস্তকেই রয়েছে প্রায় একই বিষয়বস্তুর দশটি করে অধ্যায়। বিষয়বস্তুর শিরোনাম অভিন্ন হলেও শ্রেণীভেদে উপাদান অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন—সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বয়ঃক্রম বিবেচনা করেই। দশটি অধ্যায় হলো : (১) স্রষ্টা ও সৃষ্টি/স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং হিন্দুধর্ম; (২) স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা; (৩) ধর্ম-দর্শন; (৪) ধর্মগ্রন্থ; (৫) দেবদেবী; (৬) পূজাপার্বণ/ ধর্মাচার/ধর্মাচার ও সংস্কার; (৭) নীতিজ্ঞান; (৮) ধর্মাধর্ম; (৯) উপাখ্যান এবং (১০) আদর্শ জীবনচরিত।

প্রথম অধ্যায়টিতে সাধারণভাবে স্রষ্টা ঈশ্বর এবং তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি— জল, আকাশ, বাতাস, অগ্নি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারকা, মানুষ, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। স্রষ্টার সব সৃষ্টিকে ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বভূতে ঈশ্বরের প্রকাশ, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ— এইসব ধারণা সহজ ভাষায় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণীর জন্য পুস্তকটিতে রয়েছে হিন্দুধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনাও।

অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে শ্রেণীভিত্তিক বিষয়বস্তুর বিস্তারিত আলোচনা করা হল পরবর্তী পর্বে।

[তিন]

ষষ্ঠ শ্রেণি : দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্তব-স্তোত্র অংশে দেওয়া হয়েছে বাংলা সরলার্থ-সমেত

ঋগ্বেদের 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' (১০। ৯০। ১); কঠোপনিষদের 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা' (১। ২। ১৮); শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্য' (১১। ৪৩) এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য' (১১।৮) —এই শ্লোকগুলি। প্রার্থনা অংশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তচ' (১১। ৪৬) এবং রবীন্দ্রনাথের 'আমার মাথা নত করে দাও হে'— এই গানটি।

তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া পরিচয় দেওয়া হয়েছে পাতঞ্জল যোগদর্শনের আটটি অঙ্গের— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। বর্ণনা করা হয়েছে যোগাসনের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম এবং চিত্র, অনুশীলন পদ্ধতি ও উপকারিতা সমেত পদ্মাসন ও শবাসন।

ধর্মগ্রন্থ বিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ে বেদের চারটি ভাগ— সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ নিয়ে যে বৈদিক সাহিত্য, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সহজ কথায় আলোচিত হয়েছে গীতার বিষয়বস্তু।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গ। এইসব দেবদেবীর রূপবর্ণনা, চিত্র, পূজার সময় ও প্রভাব পুস্তকে স্থান পেয়েছে, স্থান পেয়েছে সরলার্থ সমেত বিষ্ণুর প্রণামমন্ত্রও : 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়'।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পূজা ও পার্বণ কথাদুটির অর্থ এবং সামাজিক মিলন ও কল্যাণের সুযোগ সৃষ্টির সূত্রে এদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। সাধারণ পূজাবিধির আলোচনা প্রসঙ্গে পূজার আধার, আচার---অনুষ্ঠানের ক্রম এবং পঞ্চোপচার, দশোপচার ও ষোড়শোপচারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সংক্ষেপে। এরপর রয়েছে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজাপদ্ধতি। সবশেষে স্থান পেয়েছে প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্ণকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্ণকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য— এইসব নিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা।

পরের অধ্যায়ের বিষয়বস্তু নীতিজ্ঞান। গল্পচ্ছলে সংযম ও সহনশীলতা বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে প্রভু নিত্যানন্দ ও জগাই-মাধাইয়ের কাহিনি। এছাড়া আলোচনা রয়েছে ধূমপান ও মাদকতার কুফলের ওপর।

ধর্মাধর্ম সংক্রান্ত অষ্টম অধ্যায়ের আলোচনায় সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ--- ধর্মের এই দশটি স্বরূপ বা বাহ্যলক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এসবের অভাবই অধর্ম। ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী— এই কথাটি বোঝাতে গিয়ে অবতারণা করা হয়েছে চন্দ্রহাসের কাহিনি।

নবম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে কয়েকটি উপাখ্যান। যেকোনও বয়সে ঈশ্বরসাধনা করা যায়— এটি বোঝাতে গিয়ে আনা হয়েছে ধ্রুবর উপাখ্যান, ক্ষমার আদর্শ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়-দমনের কাহিনি, ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর আখ্যান এবং বুদ্ধিভেদে জ্ঞানভেদ প্রসঙ্গে প্রজাপতি ব্রহ্মার দেবতা, মানব ও দানবকে শিক্ষা-শেষে একই উপদেশ (দ) দান এবং তিনজনের কাছে অক্ষরটির আলাদা আলাদা অর্থ প্রতিভাত হওয়ার উপাখ্যানটি।

শেষ অধ্যায়ে আদর্শ জীবনচরিত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে স্বামী স্বরূপানন্দ, বামাক্ষেপা, সাধু নাগ মহাশয় এবং শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনী ও বাণী বা উপলব্ধি।

সপ্তম শ্রেণী : পুস্তকের স্তব-স্তোত্র অংশটিতে রয়েছে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের 'একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে' (৬। ১৫), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্' (১১।১৮) এবং 'নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে' (১১। ৪০), শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে' এবং 'সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং' (১১। ১০-১১) এই শ্লোকগুলি ও সামবেদের 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' (১। ১) মন্ত্রটি। প্রার্থনা অংশে রয়েছে মুণ্ডকোপনিষদের 'ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ' —এই শান্তিমন্ত্রটি এবং রবীন্দ্রনাথের 'অন্তর মম বিকশিত কর' গানটি।

বৈদিক যুগে হিন্দুধর্ম, ব্রহ্মবিদ্যা, ভক্তিযোগ এবং স্বর্গ ও নরক— এই কয়টি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে 'ধর্ম ও দর্শন' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে। এছাড়া অনুশীলন পদ্ধতি এবং উপকারিতা সমেত পশ্চিমোত্তানাসন ও শলভাসনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ছবি সহযোগে।

চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ধর্মগ্রন্থ। এখানে ১৮টি প্রধান পুরাণের নাম এবং সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত— পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে পুরাণের বিষয়বস্তুর পরিচয় এবং পুরাণ থেকে অজামিলের বৈকুণ্ঠ গমনের কাহিনিটি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আলোচিত হয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডীর তিনটি চরিতের নাম এবং সংক্ষেপে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। পরের অধ্যায়ে দেবদেবীর প্রসঙ্গে এসেছে ব্রহ্মা, শিব এবং গণেশের বিবরণ, সঙ্গে শিবের প্রণামমন্ত্র।

'পূজা-পার্বণ' অধ্যায়ের পূজা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে নারায়ণের পূজাপদ্ধতি।

কর্তব্যনিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'নীতিজ্ঞান' অধ্যায়ে। বিষয়-দুটি প্রাঞ্জল করার জন্য বীরবলের কর্তব্যনিষ্ঠা ও শ্রীরামচন্দ্রের ত্যাগতিতিক্ষার কাহিনি-দুটি পরিবেশিত হয়েছে।

'ধর্মাধর্ম' অধ্যায়ে ধার্মিকতা ও অধার্মিকতার পরিচয় দিয়ে বিষয়টি ছোটদের মনে গেঁথে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীবৎসচিন্তার আখ্যানটির অবতারণা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে রয়েছে উপাখ্যান। এখানে সঙ্গদোষের কুফল, আত্মরক্ষা, জন্মান্তরবাদ, ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান, প্রতিজ্ঞারক্ষা, ভ্রাতৃপ্রেম--- এই বিষয়গুলি ছোটদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে আমাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে নেওয়া সুন্দর সুন্দর গল্পের সাহায্যে।

শেষ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে চণ্ডীদাস, তুকারাম, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী এবং ভগিনী নিবেদিতা— এই ক'জনের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এবং তাঁদের উপদেশাবলী।

অষ্টম শ্রেণী : শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি' (৩। ৯), কঠোপনিষদের 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' (১। ২। ২৩), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে' (১১।১৫) ও 'যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা' (১১। ২৯)— এই কয়টি স্তব-স্তোত্র দিয়ে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রার্থনা অংশে রয়েছে শুক্লযজুর্বেদের 'দৃতে দৃংহ মা, মিত্রস্য মা চক্ষুষা' (৩৬। ১৮), শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'দেবি! প্রপন্নার্তিহরে! প্রসীদ' (১১। ৩) এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড থেকে 'নমস্তে শর্বানী, ঈশানী ইন্দ্রাণী... ভবার্ণবে কর পার।

'ধর্ম-দর্শন' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বিদ্যা ও ধর্মশিক্ষা প্রসঙ্গে প্রাচীন কালের বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা এবং কর্মযোগ ও তার তিনটি লক্ষণ— ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ এবং ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ। এছাড়া চিত্র সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে ভুজঙ্গাসন ও গোমুখাসনের অনুশীলন পদ্ধতি ও উপকারিতা।

পরের অধ্যায়ে 'ধর্মগ্রন্থ' প্রসঙ্গে বেদের বিভাজন এবং চারটি বেদের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সূর্য, জগদ্ধাত্রী এবং বিশ্বকর্মা— এই তিন দেবদেবীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

'ধর্মাচার' শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে এসেছে যুগধর্মের প্রসঙ্গ; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি— এই চারযুগের পরিচয় ও ব্যাপ্তিকাল; বৈদিক যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে কিছু তথ্য এবং সেই সঙ্গে হোম, ইষ্টি, পশুযাগ, সোমযাগ এবং সত্রযাগ— এই পাঁচপ্রকার যজ্ঞের কথা এবং সবশেষে ব্রহ্মচর্য,

গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস— এই চতুরাশ্রমের বর্ণনা।

'নীতিজ্ঞান' প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে সেবা, ভক্তি, প্রীতি ও দয়া— এই কয়টি গুণের মহিমা। বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্য অবতারণা করা হয়েছে যথাক্রমে সোনার বেজি, ভক্তিমতী শবরী, শ্রীকৃষ্ণ ও বাল্যসখা শ্রীদাম এবং সিদ্ধার্থ ও তিরবিদ্ধ হাঁসের কাহিনি।

'ধর্মাধর্ম' অধ্যায়ে 'ধর্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধি কথা' গল্পটির সাহায্যে দেখানো হয়েছে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়।

পরের অধ্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে কয়েকটি উপাখ্যান। চূড়ামণি যোগে গঙ্গাস্নান করলেই পাপমুক্ত হওয়া যায় না, তার জন্য প্রকৃত বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকা চাই— এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় শববেশী শিব ও সতীবেশী পার্বতীর উপাখ্যান; সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গে দুষ্টপ্রকৃতির শ্রীধরের সন্ন্যাসী সেবানন্দে উত্তরণের কাহিনি; ভক্তের জয় প্রসঙ্গে অম্বরীষের আখ্যান; অধ্যবসায় প্রসগে বহুচর্চিত ব্যোপদেবের গল্প; গার্হস্থ ও সন্ন্যাস প্রসঙ্গে ভক্ত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কাহিনি এবং ভক্ত ও পণ্ডিত অর্জুন মিশ্রের গীতার 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ' (৯। ২২) শ্লোকটিতে 'বহাম্যহম্' কথাটি কেটে 'দদাম্যহম্' লিখে দেওয়ার পর কী ঘটেছিল— সেই বৃত্তান্ত।

শেষ অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, রামঠাকুর, স্বামী প্রণবানন্দ এবং মীরাবাঈ— এই কয়টি আদর্শ জীবনচরিত।

নবম-দশম শ্রেণী : সরলার্থ সমেত ঋগ্বেদের 'অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ' (১। ১। ৩), অথর্ববেদের 'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং' (৭। ৩। ২১), শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের 'সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ' (৩। ১৬), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্' (১১। ৫)—ইত্যাদি মন্ত্র ও শ্লোক কয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্তব-স্তোত্র অংশে। প্রার্থনা অংশে রয়েছে ঋগ্বেদের 'সমানী ব আকূতি' (১০। ১৯১। ৪) এবং রবীন্দ্রনাথের 'একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে' কবিতাটি।

'ধর্ম-দর্শন' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে ধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ, ধর্মের মূল, ধমচর্চার বিভিন্নতা, আপদধর্ম এবং বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠান। এই অধ্যায়ে আরও স্থান পেয়েছে ঈশ্বরতত্ত্ব— ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর ও ভগবানের স্বরূপ; কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যোগের পরিচয়; জন্মান্তরবাদ; স্বর্গ ও নরকের ধারণা এবং যোগসাধনার প্রসঙ্গ। সবশেষে সর্বাঙ্গাসন এবং হলাসনের অনুশীলন পদ্ধতি বোঝানো হয়েছে ছবির সাহায্যে।

বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়— যথা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্, ছয়প্রকার বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং ভাগবত পুরাণের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে 'ধর্মগ্রন্থ' শীর্ষক অধ্যায়ে। দুটি আখ্যানও স্থান পেয়েছে এখানে।

অগ্নি, ইন্দ্র ও ঊষাদেবীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'দেবদেবী' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ— এই দশবিধ সংস্কার, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অশৌচ এবং আদ্যশ্রাদ্ধ— এই পাঁচটি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে 'ধর্মাচার ও সংস্কার' অধ্যায়ে।

মানবতাবোধ, মহানুভবতা, সৎসাহস, দেশপ্রেম এবং মাদকাসক্তি বর্জন— নৈতিকতার এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এক একটি সুনির্বাচিত গল্পের সাহায্যে 'নীতিজ্ঞান' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে। উপস্থাপন করা হয়েছে পৌরাণিক উপাখ্যান— রন্তিদেবের মানবতাবোধ, বশিষ্ঠের মহানুভবতা, অভিমন্যুর সৎসাহস এবং কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম প্রভৃতি।

মনুসংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ধর্ম ও অধর্মের লক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনার শেষে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় বিষয়টি হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান দিয়ে বোঝানো হয়েছে 'ধর্মাধর্ম' অধ্যায়ে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যান, মৈত্রেয়ীর কাহিনি, সিদ্ধার্থ-দেবদত্ত ও তিরবিদ্ধ হাঁসের গল্প, নিত্যানন্দ ও জগাই-মাধাইয়ের কাহিনী, দধিচীর পরহিতে আত্মত্যাগ, দস্যু রত্নাকরের ঋষিতে উত্তরণ, ধর্মবীর উশীনর এবং শ্যেন- কপোতের কাহিনি— এসব শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যান স্থান পেয়েছে নবম অধ্যায়ে।

সবশেষে, 'আদর্শ জীবনচরিত' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য, রানি রাসমণি, শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভু জগদ্বন্ধু এবং মা আনন্দময়ীর জীবনী ও উপদেশাবলি।

[চার]

বাংলাদেশের বিদ্যালয় স্তরে হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চারখানি পাঠ্যপুস্তকের বিস্তারিত পাঠ্যসূচি নিয়ে আলোচনা করা হলো। ইসলাম, বৌদ্ধ ও ক্রিশ্চান ধর্মশিক্ষার কোনও পাঠ্যপুস্তক দেখার সুযোগ বর্তমান লেখকের হয়নি। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, এই তিনটি ক্ষেত্রেও একই রকম পরিকল্পনা রয়েছে।

স্তব-স্তোত্র এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পুস্তকে কিছুটা উৎকর্ষবিধানের সুযোগ হয়ত থেকে গেছে, তবুও এই সুচিন্তিত পাঠ্যতালিকা থেকে ওদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিনির্ধারকদের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট ধরা পড়ে। তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী— এই আটবছর ধরে ধর্মশিক্ষার ওপর একটি করে আবশ্যিক পত্রে পাঠগ্রহণ করার সূত্রে যেন ছাত্রছাত্রীদের গঠনপর্বে নিজ নিজ ধর্মের মূল বিষয়গুলির ওপর একটি ধারণা গড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে মানসিক উৎকর্ষ, মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিবোধ জাগ্রত হয়, তারা উন্নত নাগরিক হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বয়সি হিন্দু ছেলেমেয়ের সঙ্গে (দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে) কথা বলে দেখা গেছে— হিন্দুধর্মের সাধারণ বিষয়, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও দেবদেবী, ধর্মাচার ও সংস্কার, বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ও ধারণা বেশ স্বচ্ছ। দু-একটি স্তব-স্তোত্রও তারা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারে অর্থসহ। লজ্জার কথা, ভারতীয় বাঙালি হিন্দুদের ক্ষেত্রে শুধু ছাত্রছাত্রী কেন, শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও এটা প্রায়শই দেখা যায় না। বিক্ষিপ্তভাবে ছাত্রছাত্রীরা হয়ত কিছু উপাখ্যান পড়ে, কোনও কোনও ধর্মগ্রন্থের কথা শোনে, পূজাপার্বণ দেখে, ধর্মগুরুদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে জেনে যায়, কিন্তু সুপরিকল্পিত, সুনির্দিষ্ট, আবশ্যিক কোনও পাঠ্যসূচির মধ্য দিয়ে যেতে না হওয়ার দরুন এসবের কোনও স্থায়ী ছাপ তাদের মনে পড়ে না। ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ— দুটি দেশই ধর্মনিরপেক্ষ। একটি দেশে নাগরিকদের মধ্যে ধর্মচেতনা তথা নীতি ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে পাঠ্যসূচিতে কোনও আলোচনা নেই। অন্যটি দেশের সবকয়টি ধর্মবিশ্বাসকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচিতে ধর্মশিক্ষা রেখেছে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে। এর ফলে বাংলাদেশি নাগরিকরা ভারতীয় নাগরিকদের তুলনায় বেশি ধর্মপ্রাণ ও নীতিবোধসম্পন্ন হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। এও ভেবে দেখতে হবে—শিক্ষানীতি নির্ধারণে প্রতিবেশী এই ছোট দেশটি থেকে আমাদেরও কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে কিনা।

তথ্যসূত্র :

হিন্দুধর্ম শিক্ষা। ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম শ্রেণি। ডঃ পরেশচন্দ্র মণ্ডল, ডঃ দিলীপকুমার ভট্টাচার্য ও নিরঞ্জন অধিকারী। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। ২০০৪, ২০০৯।

[সৌজন্যে : উদ্বোধন]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিবির

মার্চ মাসের গত ১২ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব প্রথম সংস্কৃত ভারতীর দশ দিনের সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির হয়ে গেল। প্রায় ১০০ ছাত্র শিবিরে অংশগ্রহণ করে শিক্ষাগ্রহণ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সহায়তায় এই শিবির সুসম্পন্ন হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার বাসব চৌধুরী। তিনি উপস্থিত ছাত্রদের সংস্কৃত পড়ায় উৎসাহিত করেন। সমাপ্তি কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত ভারতীর পড়ানোর পদ্ধতি দেখে তিনি মন্তব্য করেন এটাই সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। শিক্ষক হিসাবে পাঠদান করেছেন সংস্কৃত ভারতীর কার্যকর্তা বিশ্বজিৎ প্রামাণিক। বিশ্বপ্রসিদ্ধ এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভারতীর সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভালভাবেই সাড়া ফেলেছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির

আরোগ্য ভারতী পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে ও মা সারদা গ্রাম বিকাশ সমিতির পরিচালনায় তাজপুর গ্রামে গত ২৫ মার্চ রবিবার স্বাস্থ্য সচেতন বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক ডাঃ সনৎ কুমার বসু মল্লিক, কলকাতার বিশিষ্ট প্যাথলজিস্ট ডাঃ রঞ্জিত কুমার সরকার, বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপঙ্কর পতি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, আরোগ্য ভারতীর প্রান্ত সংযোজক ডাঃ গোপাল চন্দ্র কর। স্থানীয় ১০ জন চিকিৎসকও ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাজপুর হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আর এস এসের হুগলি জেলার কামারপুকুর খণ্ডের সংঘচালক শক্তিপদ পাল সভায় সভাপতিত্ব করেন। জয়রামবাটি রামকৃষ্ণ মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শান্তনু পাল তাঁর স্বাগত ভাষণে পাশ্চাত্যের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ, সুন্দর নির্মল সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় স্বাস্থ্য চিন্তা অনুসারে ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষায় অগ্রণী হতে সকলকে আহ্বান জানান। সভায় প্রায় ১৫০ জন গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে প্রায় ৯০ জন ছিলেন মা-বোনেরা।

লালন মেলা

লালন মেলা উপলক্ষে পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার থানার পুঁইজাঙ্গা গ্রামে গত ১২, ১৩ ও ১৪ মার্চ তিনদিন ব্যাপী হিন্দু ধর্মসভা এবং রামায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়ে গেল। বাংলার বিভিন্ন জেলার কলাশিল্পীদের উপস্থিতিতে বহু ধর্মপরায়ণ নাগরিকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

লালন মেলার আয়োজন সমিতির পক্ষে পূজ্য স্বামী শিবানন্দ দাস ধর্মপ্রাণ হিন্দু মা-বোনদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা দেখে অভিভূত হন। ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ সনাতন মাহাতো হিন্দু-ধর্মের পুনর্জাগরণে সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানান।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষের প্রাকবর্ষে এইরকম ধর্মের জাগরণের ফলে পুরুলিয়া জেলাতে সামাজিক সমরসতা ও শান্তির পরিবেশ তৈরি করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সমাবেশ সমাচার

শোকসংবাদ

গত ২২ মার্চ সকালে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা নিবাসী আর এস এসের শুভানুধ্যায়ী বীরেন্দ্র কুমার মুন্সী সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তাঁর সাত ছেলে, দু'মেয়ে সহ নাতি-নাতনীরা বর্তমান। পুত্র নিত্যানন্দ মুন্সী বিজেপি'র বিশিষ্ট কার্যকর্তা।

***

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগরের মাষটিকারী গ্রাম নিবাসী আর এস এসের সুন্দরবন জেলার প্রাক্তন সম্পর্ক প্রমুখ প্রতীক রায়চৌধুরীর মাতৃদেবী গত ১ ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

মঙ্গলনিধি

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলতলীর দুর্গাপুর গ্রাম নিবাসী বীণাপাণি হালদার তাঁর পুত্র সমরের সঙ্গে শিখারাণীর শুভবিবাহ উপলক্ষে গত ৮ মার্চ সমাজ-সেবার কাজের জন্য ৫০১ টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন।

মনোহরেই মজে আছেন মানস

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুল চিকিৎসা কেড়ে নিয়েছিল চলার শক্তি। জীবনে নেমে এসেছিল অন্ধকার। কিন্তু হার না মেনে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্বশ্রী, শতায়ু, কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব মনোহর আইচের মানসপুত্র বলে মনে করেন নিজেকে। উদ্যম পেয়েছেন তাঁর জীবন দর্শন থেকে। তিনি মানস বিশ্বাস। শারীরিক প্রতিবন্ধী বডিবিল্ডার এবং ভারোত্তোলক। রাজ্য ও জাতীয়স্তরে পেয়েছেন অনেক স্বীকৃতি ও সম্মান। বডিবিল্ডিং তার জীবনের অর্থই বদলে দিয়েছে। সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আর এখন মানসের পাখির চোখ লন্ডন প্যারা অলিম্পিক। লন্ডনের মূল অলিম্পিকের গায়ে গায়েই হবে প্যারা অলিম্পিক।

তখন মানসের বয়স মাত্র আট বছর। টাইফয়েড হলো। কিন্তু চিকিৎসকরা দিলেন অন্য রোগের ওষুধ। হিতে বিপরীত। রোগ তো সারলই না, উল্টে নেমে এল বিপর্যয়। কোমরের নীচ থেকে পুরো শরীরটাই অসাড় হয়ে গেল। খাতায় কলমে মানস হলেন ১০০ শতাংশ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। বেহালার চন্দ্রপল্লীর বাসিন্দা মানসের পরিবারে বরাবরই অভাবের থাবা। মানসের বাবা যোগেন্দ্রনাথবাবু ছিলেন এক বেসরকারি উদ্যানের মালি। তিনি অবসর নেওয়ার পর আর্থিক সঙ্কট প্রকট ও ব্যাপক হয়ে ওঠে। মানস ও তার মা-বাবা-ভাই মিলিয়ে চারজনের সংসার। শুধু খাই-খরচ জোগাতেই নাভিশ্বাস উঠে যায় যোগেন্দ্রনাথবাবুর। সেখানে মানসের চিকিৎসা চালানো তো কল্পনামাত্র। কিন্তু সাহায্য যে আসেনি তা নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপর্যাপ্ত।

হয়তো ক্রাচে ভর করেই কেটে যেত মানসের গোটা জীবন। কিন্তু তা হলো না। মানসের জীবনে ছিল এক ইতিবাচক দিক। ঘটনাটা এরকম— একদিন পাড়ার মাঠে বসে চূড়ান্ত হতাশায় চোখের জল ফেলছিলেন মানস। তখনই সেখানে দেবদূতের মতোই উদয় হন পাড়ারই এক যুবক সৌমেন হালদার। তিনিও প্রতিবন্ধী। বয়সে ছোট সৌমেনের থেকেই বাঁচার নতুন স্বপ্ন খুঁজে পেলেন মানস। সৌমেন তাঁকে নিয়ে গেলেন কানু মজুমদারের ব্যায়ামাগারে। মানসের শরীরচর্চার এক প্রকার হাতেখড়ি শুরু হয় ওই ব্যায়ামাগারে। প্রথমে অবশ্য ভরসা পেতেন না মানস। কিন্তু মানসিকভাবে তাঁকে উজ্জীবিত করেন কোচ কাম ট্রেনার অমল রায়। তিনি রাজ্য বডিবিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্তাও বটে।

গোবর গুহ, মনোহর আইচ, মনোতোষ রায়ের গল্প শুনিয়ে অনুপ্রাণিত করেন তাকে অমল রায়। মনের জোর পেয়ে মানস অনুশীলন শুরু করেন। বসে থাকতে থাকতে শরীরে জমেছিল মেদ। প্রথমে কোমরে বেল্ট বেঁধে কোচ ঝুলিয়ে দিতেন লোহার চাকতি। সেটা নিয়েই কোনওভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। কিছুটা হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা হাঁটার ভঙ্গিতে। আসলে ক্রাচ ছাড়লে কার্যত তাকে হামাগুড়িই দিতে হোত। আর মেরুদণ্ডে হোত অসহ্য ব্যথা। কিন্তু এতে শরীরটা অনেকটা মেদহীন হয়। ধীরে ধীরে জোর ফিরে পান মানস। মানসিক ও শারীরিক দু'ভাবেই উন্নতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ছেলের উন্নতি দেখে উৎসাহিত হন বাবা-মা। সংবাদপত্র বিক্রি করে ছেলের জন্য যথাসম্ভব পুষ্টিকর খাবার জোগাড় করে আনতেন বাবা। ভাই মনোজও উপার্জন করে দাদাকে সাহায্য করেন। টিউশনি করে দাদা ও পরিবারের পাশে দাঁড়ান মনোজ।

২০০২ সালে প্রথমে খিদিরপুর ফিজিক্যাল কালচারে জেলাস্তরের এক দেহসৌষ্ঠব টুর্নামেন্টে অংশ নেন মানস। সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে ১০০ টাকা পুরস্কারও পেলেন। পরিবারের সকলের সেকি উৎসাহ! এরপর ভারোত্তোলনে মেদিনীপুরে রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপে দ্বিতীয় হন। নৈনিতালে আয়োজিত শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের মিস্টার ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সারা দেশের ২৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে পঞ্চমস্থান অধিকার করেন মানস। কিন্তু দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনীর চেয়ে ভারোত্তোলনই বেশি আনন্দদায়ক ও আত্মবিশ্বাসের জায়গা তাঁর মনে। সেটা প্রমাণ করে দেন গত বছর। ছত্তিশগড়ের ভিলাইয়ে আয়োজিত সারা ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়ে রূপো জেতেন। মাত্র ৫০০ গ্রাম বেশি তুলে সোনা বাগিয়ে নেন মণিপুরের ছেলে। তাই এবছর পুণের জাতীয় প্রতিযোগিতায় সোনাটা তাঁর চাই-ই। সেইমতো কঠোর অনুশীলন করে চলেছেন দিনরাত।

সম্প্রতি আদর্শ-গুরু মনোহর আইচের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত এক দেহসৌষ্ঠব মিটে চাম্পিয়ন হয়েছেন। দ্রোণাচার্যের জন্মদিনে একলব্যের কাছে এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কি-ই বা হতে পারে? মানস দেখা করে আশীর্বাদ নেন গুরুর কাছ থেকে। মনোহর তাঁকে বলেন শরীর হলো মন্দির। যতই বাধা আসুক শরীরচর্চার সাধনা ছাড়বে না। মানস যতদিন বাঁচবেন দেহসৌষ্ঠব ও ভারোত্তোলনের সাধনা চালিয়ে যাবেন। তবে তার জন্য দরকার একটা চাকরি। ৩২ বছরের এই ফাইটার জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে এই জায়গায় এসেছেন। তাঁর লক্ষ্য এভারেস্ট অর্থাৎ প্যারা অলিম্পিক।

শব্দরূপ-৬২১ সুপ্রতীক ঘোষাল

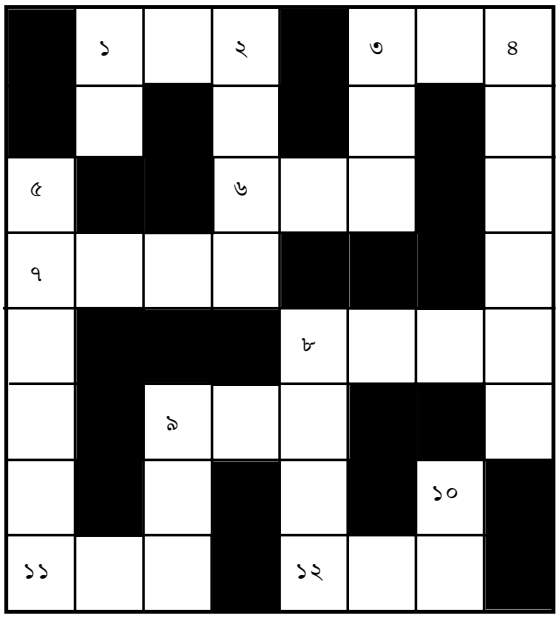

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. রাধিকার স্বামী, প্রথম দুয়ে হাসপাতালের দাই, **৩.** ফুলের রেণু, **৬.** রেখা বা শ্রেণী, **৭.** শিবের রুদ্ররূপ, **৮.** বিজয়া দশমী, **৯.** সমুদ্র, এক দু'য়ে নীর, **১১.** ইনি বিখ্যাত ঋষি, আগাগোড়া তাড়াতাড়ি মুখে পোরার শব্দ বিশেষ, **১২.** তৎসম জোনাকি।

উপর-নীচ : ১. বিশেষণে সমৃদ্ধ, ধনী, পদবী বিশেষ, **২.** পালকপিতার পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ, আগাগোড়া পাইপ, **৩.** বায়ুর অধিদেবতা, **৪.** অষ্টাদশ এই গ্রন্থে চিকিৎসাদি শাস্ত্র বিবৃত হয়েছে, প্রথম তিনে বিষ্ণুর বাহন, চারে-পাঁচে সম্পূর্ণ, **৫.** হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান, প্রথম তিনে মৃত্যুহীন, শেষ তিনে কাঁটা, **৮.** সুগ্রীবের মাতুল, প্রথম দু'য়ে দই, শেষ দু'য়ে বদন, **৯.** জমির মাপ, আগাগোড়া ইষ্টমন্ত্র, **১০.** প্রদীপ, দীপ।

সমাধান
শব্দরূপ-৬১৮
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৭০০০০৬

■	■	■	অ	■	গা	ণ্ডী	ব
■	ব	না	গ্নি	■	য়ে	■	উ
ব	■	■	স	মা	ন	■	ক
দ	ধি	মু	খ	■	■	■	থা
রী	■	■	■	শ	তা	নী	ক
কা	■	কি	রা	ত	■	■	ও
শ্র	■	ন্ন	■	রূ	প	সী	■
ম	ন্দা	র	■	পা	■	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৬২১ সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ মে, ২০১২ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ১৮

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
9 April - 2012

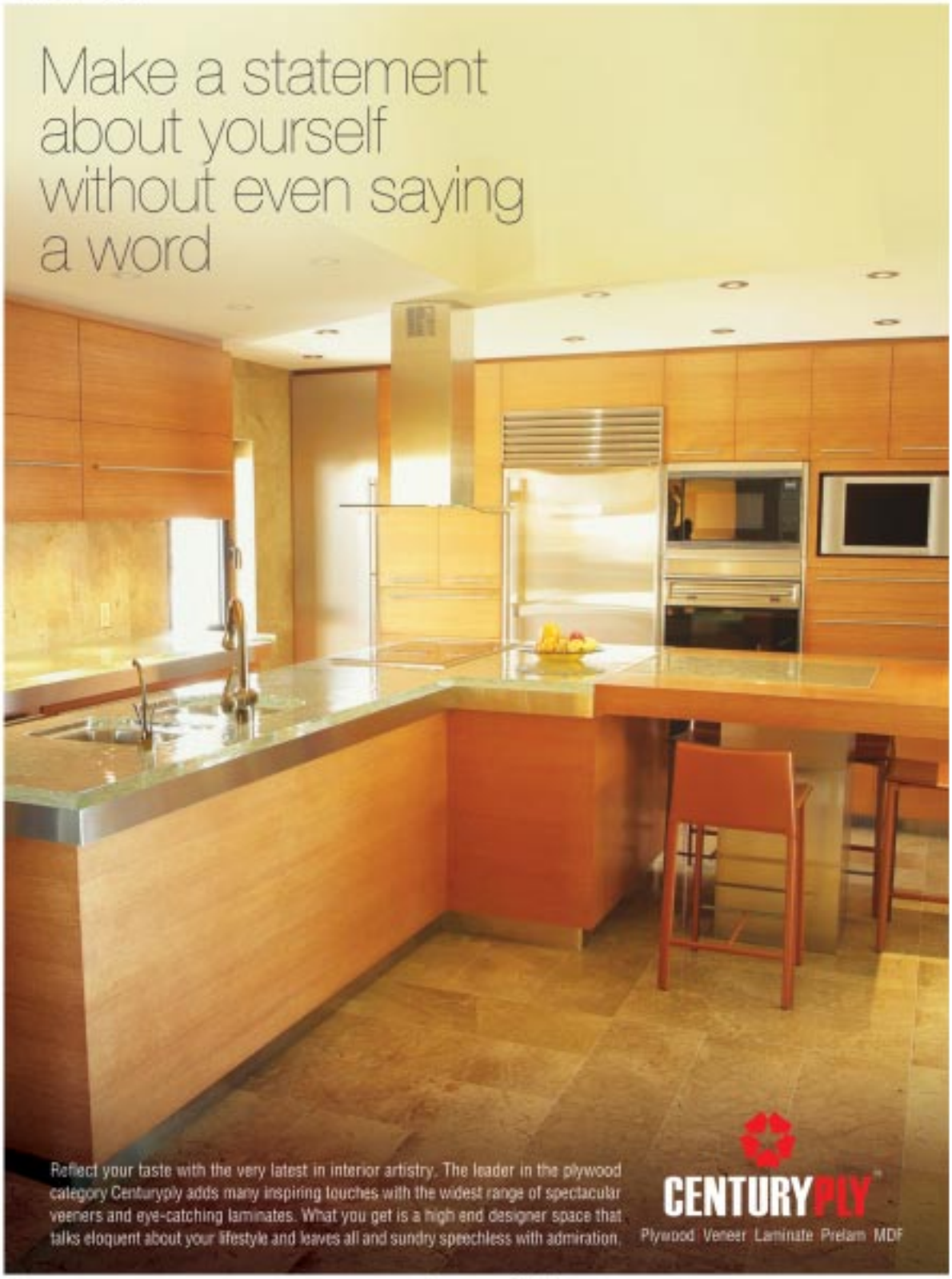

দাম : ৭.০০ টাকা